ফয়যানে মদীনা

জুন ২০১৬

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল মদীনা

- "الوعدوان" এর কুরআনী অর্থ
- মরহুম পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ
- যুদ্ধ পরিস্থিতির অদৃশ্য সংবাদ
- ইমাম হোসাইনের শিক্ষা এবং এর সমসাময়িক গুরুত্ব (পর্ব ০১)
- কন্যাদের ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দিন
- ইসলামের পয়গম্বরগণ এতিমদের রক্ষক

উপস্থাপনায়:

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া

Islamic Research Center

ফয়যানে মদীনা

জুন ২০২৬

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা
দেখতে থাকুন

"اثم و عدوان" এর কুরআনী অর্থ

মাওলানা আবুন নূর রাশিদ আলী আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং সৎ ও খোদাভীরুতার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করোনা এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয় আল্লাহর শাস্তি কঠোর।

(পারা: ৬, সূরা: মায়েদা: ২)

এই আয়াতে করীমায় চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উল্লেখ রয়েছে: البر (নেকী), التقوىٰ (পরহেযগারী), الاثم (গুনাহ) এবং العدوان (সীমালঙ্ঘন)। প্রথম দুটি উপাদান এমন, যাতে সহযোগিতা ও সহায়তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর শেষ দুটি উপাদান এমন, যাতে সহায়তা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

"البر এবং التقوىٰ"-তে সহযোগিতা এবং এর মর্মার্থ "মাসিক ফয়যানে মদীনা" এপ্রিল ও মে সংখ্যায় করা হয়েছে, আর "الاثم এবং العدوان"-এ সহযোগিতা না করার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ এই প্রবন্ধে লক্ষ্য করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক সূরা মায়েদায় "الاثم ও العدوان"-এ সহায়তা করা এবং সূরা মুজাদালায় "العدوان ও الاثم"-এ কানাকানি করতে নিষেধ করেছেন। আসুন কুরআনে করীমের আলোকেই জানি যে, কোন কোন আমল ও চিন্তাধারা الاثم ও العدوان এর অন্তর্ভুক্ত?

الاثم এর কুরআনী অর্থ

"الاثم" শব্দটি আরবি ভাষায় গুনাহ, অবাধ্যতা এবং ভুলের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনে করীমে الاثم কে البر এর বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। আসুন দেখি যে, কুরআনে করীম কোন কোন আমল, আদর্শ ও আকিদাকে الاثم এর অন্তর্ভুক্ত করেছে।

মদ ও জুয়া হলো "الاثم":

আল্লাহ পাক সূরা বাকারায় মদ ও জুয়া সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَاِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনাকে মদ ও জুয়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন, 'সে দু'টিতে মহাপাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু পার্থিব উপকারও। আর সে দু'টির পাপ সে দু'টির উপকার অপেক্ষা বড়'।

(পারা: ২, সূরা: বাকারা: ২১৯)

এই আয়াতে আল্লাহ পাক স্পষ্টভাবে মদ ও জুয়াকে "اثم كبير" অর্থাৎ বড় গুনাহ সাব্যস্ত করেছেন। এটি বাস্তব যে, এতে কিছু দুনিয়াবী উপকার থাকতে পারে, যেমন; মদ দ্বারা সাময়িক আনন্দ বা জুয়া দ্বারা তাৎক্ষণিক আর্থিক লাভ, কিন্তু এর ক্ষতি এর উপকারের চেয়ে অনেক বেশি।

মদ মানুষের বিবেককে অবশ করে দেয়, যা মানুষের সবচেয়ে বড় নেয়ামত। যখন বিবেক অবশ হয়ে যায়, তখন মানুষ সব ধরণের মন্দ কাজ করতে পারে। সে নামায পড়তে পারে না, নিজের পরিবার-পরিজনের খেয়াল রাখতে পারে না এবং সমাজে ফাসাদ ছড়ায়। জুয়া মানুষকে অলস বানিয়ে দেয়।

কু-ধারণা হলো "الاثم":

আল্লাহ পাক সূরা হুজুরাতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান পাপ হয়ে যায় এবং দোষ তালাশ করো না আর একে অপরের গীবত করো না। (পারা: ২৬, সূরা: হুজুরাত: ১২)

এই আয়াতে আল্লাহ পাক কিছু ধারণাকে গুনাহ সাব্যস্ত করেছেন। ধারণা বলতে সেই সংশয়কে বুঝায়, যা কোনো প্রমাণ ছাড়াই করা হয়। যদি কারো সম্পর্কে কোনো প্রমাণ ছাড়াই মন্দ ধারণা রাখা হয়, তবে তা গুনাহ। ইসলাম মুসলমানদের শিখিয়েছে যে, তারা যেন একে অপরের প্রতি সু-ধারণা রাখে। কু-ধারণা থেকে মানুষের অন্তরে অন্য মুসলমানের জন্য ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং এটি সমাজে বিশৃঙ্খলার কারণ হয়।

মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা "الاثم":

আল্লাহ পাক সূরা বাকারায় ইরশাদ করেন:

وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۸﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং পরস্পরের মধ্যে একে অপরের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং না বিচারকদের নিকট তাদের মুক্বাদ্দমা এজন্য পৌঁছাবে যে, লোকজনের কিছু ধনসম্পদ অবৈধভাবে গ্রাস করে নেবে, জেনে বুঝে। (পারা: ২, সূরা: বাকারা: ১৮৮)

এই আয়াতে আল্লাহ পাক মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করাকে الاثم সাব্যস্ত করেছেন। এতে সেই সমস্ত পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাতে মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে অর্জন করা হয়, যেমন; চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, ধোঁকাবাজি, সুদ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান ইত্যাদি। আয়াতে এও বলা হয়েছে যে, কিছু মানুষ বিচারকদের কাছে মিথ্যা মামলা নিয়ে যায় যাতে তাদের মাধ্যমে অন্যদের সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারে। এটি অত্যন্ত বড় গুনাহ কারণ এতে মিথ্যা, ধোঁকা এবং অত্যাচার সবকিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শিরিক হলো "اثم عظيم":

আল্লাহ পাক সূরা নিসায় ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿۴۸﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ এটা ক্ষমা করেন না যে, তাঁর সাথে কুফর (শিরিক) করা হবে এবং কুফরের নিম্নে যা কিছু আছে তা যাকে চান ক্ষমা করে দেন; এবং যে খোদার শরীক স্থির করেছে সে মহা পাপের তুফান গড়েছে।

(পারা: ৫, সূরা: নিসা: ৪৮)

শিরিক সবচেয়ে বড় গুনাহ, কারণ এতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা হয়। আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে রিযিক দিয়েছেন, তাকে সমস্ত নেয়ামতে ভূষিত করেছেন; কিন্তু যদি মানুষ অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে তবে তা সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা।

আল্লাহ পাক সূরা নিসায় শিরিককে অপবাদ এবং "اثم مبين" অর্থাৎ প্রকাশ্য গুনাহ সাব্যস্ত করেছেন:

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۵۰﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: দেখুন, তারা আল্লাহ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা রচনা করছে? এবং এটাই যথেষ্ট প্রকাশ্য পাপরূপে।

(পারা: ৫, সূরা: নিসা: ৫০)

অপবাদ হলো "الاثم":

আল্লাহ পাক সূরা নিসায় ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۱۱۲﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং যে ব্যক্তি কোন দোষ কিংবা পাপ উপার্জন করেছে, অতঃপর সেটা কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর নিক্ষেপ করেছে, সে অবশ্যই অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহ্ বহন করেছে। (পারাঃ ৫, সূরা নিসাঃ ১১২)

কোনো নির্দোষ ব্যক্তির উপর দোষারোপ করা দ্বিগুণ গুনাহঃ এক তো নিজে গুনাহ করা, দ্বিতীয়ত তা কোনো নির্দোষের উপর চাপিয়ে দেওয়া। এটি অত্যন্ত বড় অত্যাচার এবং আল্লাহ পাক একে "অপবাদ" ও "اثم مبین" অর্থাৎ স্পষ্ট গুনাহ সাব্যস্ত করেছেন।

اثم এর সারসংক্ষেপ ও সতর্কবাণী

কুরআনে করীমের উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, اثم একটি বিস্তৃত পরিভাষা, যা সমস্ত গুনাহকে নিজের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। এতে আকিদার গুনাহ (যেমন; শিরিক), ইবাদতের গুনাহ (যেমন; নামায ত্যাগ করা), নৈতিক গুনাহ (যেমন; মিথ্যা, গীবত, কু-ধারণা) এবং লেনদেনের গুনাহ (যেমন; চুরি, ধোঁকা, ঘুষ) সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক আমাদের সকল ধরণের গুনাহ থেকে বাঁচার নির্দেশ দিয়েছেন, তা জাহেরী হোক বা বাতেনী, ছোট হোক বা বড়। গুনাহ মানুষকে আল্লাহ পাক থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তার অন্তরকে কালো বানিয়ে দেয় এবং আখিরাতে আযাবের মাধ্যম হয়। অতএব আমাদের উপরে উল্লিখিত প্রতিটি কাজ থেকে বাঁচতে হবে এবং দূরে থাকতে হবে যা "اثم" এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া নিজে বাঁচার পাশাপাশি কোনো প্রকার এমন ধরণ অবলম্বন করা যাবে না, যাতে আমাদের কারণে বা مَعَاذَ الله আমাদের মাধ্যমে কেউ এই গুনাহগুলোতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

العدوان এর কুরআনীয় অর্থ

"العدوان" শব্দটি আরবি ভাষায় সীমালঙ্ঘন করা, অত্যাচার করা এবং সীমালঙ্ঘন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনে করীমে এর নিষেধাজ্ঞা অনেক আয়াতে এসেছে। বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন পরস্পর ঐক্য বজায় রাখে, কিন্তু তারা একে অপরকে হত্যা করত এবং ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিত এবং এই অত্যাচারে পরস্পরকে সহায়তাও করত। আল্লাহ পাক একে তাদের অত্যাচারের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সূরা বাকারায় রয়েছেঃ

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُوْنَ فَرِیْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِیَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَیْهِمْ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ অতঃপর এই যে, তোমরা! আপন লোকদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করেছো এবং আপন লোকদের মধ্য থেকে একটা দলকে তাদের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছো, তাদের বিরুদ্ধে (তাদেরই বিরুদ্ধপক্ষীয়দেরকে) সাহায্য করছো গুনাহ্ ও সীমালঙ্ঘনে।

(পারাঃ ১, সূরা বাকারাঃ ৮৫)

সূরা নিসায় অন্যদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ এবং হত্যা ও লুণ্ঠন থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং এই জঘন্য কাজ করাকে "عدوان" ও অত্যাচার সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿۳۰﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যে অত্যাচর ও সীমালঙ্ঘন করে এমন করবে, তবে অনতিবিলম্বে আমি তাকে আগুনে প্রবিষ্ট করবো এবং এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজসাধ্য।

(পারা: ৫, সূরা: নিসা: ৩০)

সারকথা হলো যে, العدوان প্রত্যেক প্রকারের সীমালঙ্ঘন ও অত্যাচারের নাম। এতে আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন, মানুষের অধিকার হরণ করা, তাদের উপর অত্যাচার করা, তাদের প্রতি শত্রুতা রাখা, হারাম সম্পদ আত্মসাৎ করা এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতা; সবকিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ পাক মুসলমানদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন কারো প্রতি সীমালঙ্ঘন না করে। ইসলাম ন্যায়ের দ্বীন এবং অত্যাচার থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করে। এমনকি শত্রুর সাথেও ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ পাক আমাদের নেকী ও তাকওয়ায় পরস্পরকে সহযোগিতা করার এবং গুনাহ, সীমালঙ্ঘন ও অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হাদীসে রাসূলের ব্যাখ্যা

মরহুম পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ

মাওলানা এজায নেওয়াজ আত্তারী মাদানী

হযরত আবু ওসাইদ মালিক বিন রাবীআ সায়েদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, আমরা নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি আসলো এবং জিজ্ঞাসা করলো: "ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার পিতা-মাতা মারা যাওয়ার পর কি তাঁদের সাথে কোনো প্রকার নেকী বা কল্যাণ করার সুযোগ আছে?" প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

نَعَمۡ! الصَّلَاۃُ عَلَیۡہِمَا وَالۡاِسۡتِغۡفَارُ لَہُمَا وَاِنۡفَاذُ عَہۡدِہِمَا مِنۡ بَعۡدِہِمَا وَصِلَۃُ الرَّحِمِ الَّتِیۡ لَا تُوۡصَلُ اِلَّا بِہِمَا وَاِکۡرَامُ صَدِیۡقِہِمَا

অনুবাদ: হ্যাঁ! তাঁদের জন্য দোয়া করা, তাঁদের জন্য ইস্তিগফার করা, তাঁদের কৃত ওয়াদা পূরণ করা, তাঁদের ঐ সকল আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, যাদের সাথে সম্পর্ক শুধুমাত্র তাঁদের কারণেই এবং তাঁদের বন্ধুদের সম্মান করা।" (আবু দাউদ, ৪/৪৩৪, হাদীস: ৫১৪২)

হাদীস বর্ণনাকারী:

হযরত আবু ওসাইদ মালিক বিন রাবীআ সায়েদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একজন আনসারী এবং বদরী সাহাবী। তিনি হুযূর নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বসরা যাওয়ার পর ৬০ হিজরীতে ৭৮ বছর বয়সে ওফাত লাভ করেন। বদরী সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষ ওফাত লাভ করা ব্যক্তি তিনিই। বদরী সাহাবায়ে কিরামের সম্মান ও মহত্ব কুরআনে মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে।

(ফয়যানে রিয়াযুস সালেহীন, ৪/৫০)

হাদীসের ব্যাখ্যা:

এই হাদীসে পাকে মরহুম পিতা-মাতার ৫টি হকের কথা বলা হয়েছে, যা তাঁদের সাথে সদাচরণ ও কল্যাণের মাধ্যমও বটে: (১) তাঁদের জানাযার নামায পড়া (২) তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা (৩) তাঁদের কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদা পূরণ করা (৪) তাঁদের

আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা (৫) এবং তাঁদের বন্ধুদের সম্মান করা। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: "পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর তাঁদের সাথে সদাচরণ করার পদ্ধতি হলো যে, সন্তান প্রতি নামাযের পর নিজের পিতা-মাতার জন্য দোয়া করতে থাকবে, তাঁদের নামে সদকা ও খয়রাত করবে, তাঁদের পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করবে বা অন্য কাউকে দিয়ে করাবে, তাঁদের তৃতীয় দিবস, দশম দিবস, চেহলাম, মৃত্যুবার্ষিকী পালন করবে। কিছু মানুষ তাঁদের পিতা-মাতার শুরু করা ভালো কাজগুলো বজায় রাখে; যদি পিতা-মাতা কোনো বিশেষ তারিখে দান-খয়রাত করতেন বা মীলাদ শরীফ, গেয়ারভী শরীফ করতেন, তবে তাঁরা তা সর্বদা পালন করবে। যে মসজিদে তাঁরা নামায পড়তেন, সেই মসজিদ আবাদ করার চেষ্টা করবে।" তিনি আরও বলেন: "যেসব আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক শুধুমাত্র মা অথবা বাবার কারণে, অন্য কোনো কারণে নয়, তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করা আমার পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মাধ্যম। এতে ভাই-বোন, চাচা-মামা, ফুফু-খালা সবাই অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের সাথে এই উদ্দেশ্যে সদাচরণ করবে, যাতে পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জন হয়, নিজের নাম বা সুখ্যাতি লক্ষ্য না হয়। মোটকথা এই আত্মীয়দের এই উদ্দেশ্যে খেদমত করবে, যাতে পিতা-মাতা সন্তুষ্ট হন এবং পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি নিহিত। এছাড়া সন্তান বাবার বন্ধুদের এবং মায়ের বান্ধবীদেরও সম্মান করবে।" (মিরাতুল মানাজীহ, ৬/৫৩২ ও ৫৩৩) এগুলো আল্লাহ পাক এবং রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উন্নত শিক্ষা। এটি উত্তম আচরণের এক মহান দিক, এটি সচ্চরিত্রের শিখর। এটি মানবাধিকারের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও অনন্য দিক যে, দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া পিতা-মাতারও হক বা অধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সন্তানের উপর মরহুম পিতা-মাতার হকসমূহ:

ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসের আলোকে মরহুম পিতা-মাতার ১২টি হক বর্ণনা করেছেন, যার সার-সংক্ষেপ লক্ষ্য করুন:

(১) মৃত্যুর পর তাঁদের গোসল, কাফন, নামায ও দাফনের ব্যবস্থা করা এবং এই কাজগুলোতে সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা, যাতে তাঁদের জন্য কল্যাণ, বরকত, রহমত ও প্রশস্ততার আশা থাকে। (২) তাঁদের জন্য সর্বদা দোয়া ও ইস্তিগফার করতে থাকা। (৩) সদকা, খয়রাত ও নেক আমলের সাওয়াব তাঁদের এবং সমস্ত মুসলমানদের নিকট পৌঁছাতে থাকা; এতে তাঁদের সবার নিকট সাওয়াব পৌঁছে যাবে এবং তার সাওয়াবে কোনো কমতি হবে না বরং আরও উন্নতি লাভ করবে। (৪) তাঁদের উপর কারো ঋণ থাকলে তা পরিশোধে দ্রুততার চেষ্টা করা এবং নিজের সম্পদ থেকে তাঁদের ঋণ পরিশোধ হওয়াকে উভয় জাহানের সৌভাগ্য মনে করা। (৫) তাঁদের উপর কোনো ফরয বাকি থাকলে সাধ্যানুযায়ী তা আদায়ের চেষ্টা করা। হজ্ব না করে থাকলে তাঁদের পক্ষ থেকে হজ্ব করা বা বদলী হজ্ব করানো। যাকাত বা ওশর অনাদায়ী

থাকলে তা আদায় করা। নামায বা রোযা বাকি থাকলে তার কাফফারা দেওয়া ইত্যাদি। (৬) তাঁরা কোনো জায়িয শরীয়ত সম্মত ওসিয়ত করে থাকলে যথাসম্ভব তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা, যদিও শরীয়ত অনুযায়ী নিজের উপর তা আবশ্যক নয় বা নিজের নফসের উপর তা ভারী হয়। (৭) তাঁদের করা শপথ তাঁদের মৃত্যুর পরও সত্য রাখা। যেমন; বাবা-মা শপথ করেছিলেন যে, আমার ছেলে অমুক জায়গায় যাবে না বা অমুকের সাথে দেখা করবে না বা অমুক কাজ করবে না, তবে তাঁদের জীবদ্দশায় যেমন সন্তান অনুগত থাকত, মৃত্যুর পরও তেমনি অনুগত থাকা, যতক্ষণ না কোনো শরীয়ত সম্মত প্রতিবন্ধকতা আসে। আর শুধু শপথই নয়, বরং জায়িয বিষয়সমূহে মৃত্যুর পরও তাঁদের মর্জির অনুগত থাকা। (৮) প্রতি জুমায় তাঁদের কবর যিয়ারতে যাওয়া, সেখানে ইয়াসীন শরীফ পড়া এমন আওয়াজে যাতে তাঁরা শোনেন এবং এর সাওয়াব তাঁদের রূহে পৌঁছে দেওয়া। পথে যখনই তাঁদের কবর পড়বে, সালাম ও ফাতিহা ছাড়া অতিক্রম না করা। (৯) তাঁদের আত্মীয়দের সাথে সারাজীবন উত্তম আচরণ করা। (১০) তাঁদের বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখা, সর্বদা তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া। (১১) কখনো কারো বাবা-মাকে গালি দিয়ে বিনিময়ে নিজের বাবা-মাকে গালি না শুনানো । (১২) সবকিছুর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন, ব্যাপক ও স্থায়ী হক হলো যে, কখনো কোনো গুনাহ করে তাঁদের কবরে কষ্ট না দেওয়া। কারণ সন্তানের সমস্ত আমলের খবর বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছে। নেকী দেখলে তাঁরা খুশি হন এবং তাঁদের চেহারা খুশিতে ঝলমল ও উজ্জ্বল হয়; গুনাহ দেখলে তাঁরা ব্যথিত হন এবং তাঁদের হৃদয়ে আঘাত লাগে। বাবা-মায়ের হক এটা নয় যে, তাঁদের কবরেও কষ্ট দেওয়া হবে।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৩৯১)

পিতা-মাতার খেদমতের নিয়ত কী হওয়া উচিত?

পিতা-মাতার খেদমত কোনো দুনিয়াবী স্বার্থ বা লোভ ছাড়া হওয়া উচিত। সুতরাং বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাদীস ব্যাখ্যাকারক আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সন্তানদের জন্য পিতা-মাতার কিছু হক বর্ণনা করার পর বলেন: "যে ব্যক্তি পিতা-মাতার খেদমতগার, তার জন্য এটি সমীচীন নয় যে, সে তাঁদের খেদমতের মাধ্যমে নিজের পদের আকাঙ্ক্ষী হবে। তবে যদি তাতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার সন্তুষ্টি থাকে (তবে ভিন্ন কথা)। আর তাঁদের খেদমত করার মাধ্যমে লোক দেখানো মনোভাবের শিকার হবে না, কারণ এই অবস্থায় তাঁদের খেদমত করা গুনাহ। আর এমন ব্যক্তির রিয়াকারী অচিরেই আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দিবেন এবং এর ফলে পিতা-মাতার অন্তর থেকে তার মর্যাদা ছিন্ন হয়ে যাবে।"

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৮/৬৬৯, ৪৯৩৬ নং হাদীসের পাদটীকা)

অতএব মৃত্যুর পরও হক আদায়ের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি খেয়াল রাখবে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে জীবদ্দশায় এবং ইন্তিকালের পরও পিতা-মাতার হক যথাযথভাবে আদায় করতে থাকার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

যুদ্ধ পরিস্থিতির অদৃশ্য সংবাদ

মাওলানা সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

প্রিয় শিশুরা! আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযাসমূহের মধ্যে একটি মুজিযা হলো ইলমে গায়েব (অদৃশ্যের জ্ঞান)। অর্থাৎ বারবার নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোনো বাহ্যিক মাধ্যম ছাড়াই অতীত বা ভবিষ্যতের ঘটনাবলী এবং গোপন অবস্থা ও বিষয়াদী সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। আসুন! তাঁর ইলমে গায়েব সংক্রান্ত একটি ঘটনা পড়ি। ৮ হিজরীতে মুতার যুদ্ধ তখনই সংঘটিত হয়েছিল যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দূত হযরত হারিস বিন উমায়ের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে শুরাহবিল গাসসানি শহীদ করে দিয়েছিল। অথচ এর আগে কখনো রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোনো দূতকে হত্যা করা হয়নি। এর প্রেক্ষিতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ৩০০০ মুজাহিদের একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং হযরত যায়েদ বিন হারিসাকে আমীর নিযুক্ত করেন। পাশপাশি এও ইরশাদ করেন যে, যদি তিনি শহীদ হয়ে যান তবে হযরত জাফর বিন আবি তালিব আমীর হবেন এবং যদি তিনিও শহীদ হয়ে যান তবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা আমীর হবেন; আর তাঁদের শাহাদাতের পর মুসলমানরা নিজেরা কাউকে নির্বাচিত করে নেবে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি সাদা পতাকা দিয়ে এই নির্দেশনা দেন যে, প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিবে, যদি কবুল না করে তবে লড়াই করবে; আর তিনি নিজে 'সানিয়াতুল বিদা' পর্যন্ত তাঁদের বিদায় জানাতে তাশরীফ নিয়ে যান। অন্যদিকে শত্রু পক্ষ সংবাদ পেয়ে দুই লক্ষাধিক সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করে।

যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের সংখ্যা এবং সাজ-সরঞ্জাম অনেক বেশি ছিল, কিন্তু মুসলমানরা অবিচল থাকলেন। একে একে হযরত যায়েদ বিন হারিসা, হযরত জাফর বিন আবি তালিব এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ তিনজনেই শহীদ হয়ে যান। অবশেষে মুসলমানরা পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে হযরত খালিদ বিন

ওয়ালিদকে আমীর বানান, যিনি চমৎকার রণকৌশলের মাধ্যমে শত্রুদের ক্ষতি সাধন করেন এবং মুসলমানদের নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। (যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৩/৩৪০-৩৫০)

আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে রণক্ষেত্রের দৃশ্য উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন, ফলে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা শরীফে অবস্থান করেও যুদ্ধের সমস্ত পরিস্থিতি অবলোকন করছিলেন। এই কারণেই মদীনায় যুদ্ধের সংবাদ পৌঁছানোর আগেই নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের তিনজন সেনাপতির শাহাদাতের সংবাদ মানুষকে দিয়ে দিয়েছিলেন। আরও ইরশাদ করেছিলেন যে, এখন আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্য থেকে একটি তলোয়ার (হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ) পতাকা হাতে নিয়েছে, অবশেষে আল্লাহ তাঁর হাতে বিজয় দান করেন। (বুখারী, ২/৫৪৮, হাদীস: ৩৭৫৭)

যখন ইয়া'লা বিন উমাইয়া মুতার যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে ফিরে আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি চাইলে আমাকে বলতে পারো আর যদি চাও তবে আমি তোমাকে যুদ্ধের পরিস্থিতি বলে দিতে পারি। তিনি আরয করলেন: আপনিই বলে দিন। তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। এর প্রেক্ষিতে তিনি বললেন: ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি তাঁদের অবস্থার একটি অক্ষরও বাদ দেননি।

(যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৩/৩৫৫)

নিশ্চিতভাবে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরে হওয়া যুদ্ধের অবস্থা মদীনায় থেকে এভাবে বলে দেওয়া মুস্তফার ইলমে গায়েবের এক উজ্জ্বল দলিল। এই ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় শিখতে পারি:

১. মুসলমানকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থাকা উচিত, চাই বিরোধী পক্ষ যত বেশিই হোক না কেন।

২. আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে নবুয়তের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আল্লাহ পাক তাঁকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন।

৩. কঠিন পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাওয়ার পরিবর্তে সাহস ও অবিচলতার পরিচয় দেওয়া উচিত।

৪. একজন ভালো নেতা সেই, যে পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা করেন এবং সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

৫. ইসলাম আমাদের শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের গুরুত্ব শিক্ষা দেয় যে, প্রতিটি কাজ একজন আমীরের অধীনে হওয়া উচিত।

৬. সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর জীবনী আমাদের দ্বীনের জন্য ত্যাগের প্রেরণা প্রদান করে।

৭. বড় কোনো ক্ষতির পরও হিম্মত না হারানো এবং পরামর্শের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যাওয়া সফলতার মাধ্যম হয়ে থাকে।

৮. যে কাজ মুসলমানদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হয় তাতে বরকত থাকে।

৯. নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও একাগ্রতা হলো সফলতার চাবিকাঠি।

১০. নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীদের সাথে ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক আমাদের নিজেদের সাথীদের সাথে ভালোবাসা ও কল্যাণ কামনার শিক্ষা দেয়।

শিশুদের জন্য প্রিয় হাদীস

বড়দের সম্মান করুন

মাওলানা মুহাম্মদ জাভেদ আত্তারী মাদানী

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللّٰهِ اِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহর সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত হলো বয়স্ক মুসলমানকে সম্মান করা।

(আবু দাউদ, ৪/৩৪৪, হাদীস: ৪৮৪৩)

এই হাদীস পাকের ব্যাখ্যায় রয়েছে: বয়স্ক মুসলমানকে সম্মান করো অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার চুল সাদা হয়ে গেছে এবং যার জীবন ইসলাম ও ঈমানের অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে।

(দালিলুল ফালিহীন, ২/১২, ৩৫৪ নং হাদীসের পাদটীকা)

প্রিয় শিশুরা! আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের উত্তম ও উন্নত চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। এই হাদীস পাকে বড়দের অধিকারের গুরুত্ব স্পষ্ট করা হয়েছে এবং বড়দের সম্মানকে আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সাথে সম্পৃক্ত করে বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ যে বড়দের সম্মান করে, সে যেন আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করে।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা প্রত্যেক বাড়ি, পাড়া-মহল্লা বা বংশের অংশ হয়ে থাকেন। তাঁরা ঘরের শোভা হন, তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা ইসলামের শিক্ষা। তাঁদের খেদমত করা উচিত, তাঁদের কাছে বসা উচিত, তাঁদের সময় দিয়ে কথা বলে তাঁদের মন ভালো রাখা ও তাঁদের থেকে দোয়া নেওয়া উচিত এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা থেকে উপকার অর্জন করা উচিত। যে শিশু বড়দের সম্মান করে, মানুষ তাকে ভালোবাসে।

কিছু শিশু বয়স্ক ব্যক্তিদের বিরক্ত করে, তাঁদের কোনো জিনিস লুকিয়ে রেখে, তাঁদের কথা অমান্য করে, তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং তাঁদের নিষেধ করা সত্ত্বেও তাঁদের সামনে চিল্লাচিল্লি করে, যার ফলে তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে যান।

ভালো শিশুরা! আপনারা বড়দের বিরক্ত করবেন না বরং তাঁদের কাজে আসবেন। রাস্তা পার করে দিবেন, মালামাল বহন করে দিবেন বা ওযু করাতে সাহায্য করবেন। তাঁদের কথা মাঝপথে থামিয়ে দিবেন না। বড়দের আগে সালাম দিবেন, তাঁদের হাত চুম্বন করবেন, রাস্তায়

চলার সময় তাঁদের জন্য পথ ছেড়ে দিবেন এবং তাঁদের আগে আগে চলবেন না। খাওয়ারের সময় দস্তরখানায় যদি কোনো বড় ব্যক্তি থাকেন, তবে তাঁদের আগে খাওয়া শুরু করবেন না। তাঁদের নাম ধরে ডাকবেন না বরং সুন্দর সম্বোধনে ডাকবেন, যেমন; আঙ্কেল, চাচাজান, দাদাজান ইত্যাদি।

বড়দের সামনে নিজে উঁচু বা ভালো জায়গায় বসবেন না। যেমন; তাঁরা যদি নিচে বসে থাকেন, তবে তাঁদের সামনে সোফা ইত্যাদিতে বসবেন না, কেননা এটিও তাঁদের প্রতি সম্মানের অংশ। একইভাবে যখন কোনো বয়স্ক ব্যক্তি ট্রেন বা বাস ইত্যাদিতে আসবেন, তখন সম্ভব হলে তাঁদের জন্য আসন ছেড়ে দিবেন এবং ভালো জায়গায় বসার আমন্ত্রণ জানাবেন। এর শিক্ষা নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের আমল দ্বারা দিয়েছেন। একবারের ঘটনা, যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুধমা তাঁর নিকট তাশরীফ আনলেন, তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর বসার জন্য নিজের মুবারক চাদর বিছিয়ে দিলেন। (মিরাতুল মানাজীহ, ৬/৫৩৩)

মনে রাখবেন! আজ আমরা যা কিছু পড়লাম, তার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো শুরুতে লেখা সেই হাদীসে পাক। সুতরাং আপনারাও নিজেদের বাড়িতে, মহল্লায়, বংশে এবং মসজিদে আগত বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করবেন এবং হাদীস পাকের উপর আমল করে বরকত অর্জন করবেন।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে বড়দের আদব ও সম্মান করার তাওফীক দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

হযরত ইমাম হোসাইনের শাহজাদা ও শাহজাদীদের সংখ্যা

প্রশ্ন: ইমামে আলী মাক্বাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কতজন শাহজাদা ও কতজন শাহজাদী ছিলেন?

উত্তর: ইমাম মুহিব্বুদ্দীন তাবারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর কিতাব "যাখায়িরুল উকবা"-তে বলেন: ইমামে আলী মাক্বাম হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ছয়জন শাহজাদা এবং তিনজন শাহজাদী ছিলেন। শাহজাদাদের নামগুলো হলো: (১) আলী আকবর (২) যয়নুল আবেদীন (৩) আলী আসগর (৪) মুহাম্মদ (৫) আব্দুল্লাহ (৬) জাফর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ। আর শাহজাদীদের নামগুলো হলো: (১) যায়নব (২) সুকাইনা (৩) ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُنَّ। (যাখায়িরুল উকবা, পৃষ্ঠা: ২৫৮) মানুষের মাঝে 'সাকীনা' (সীন এর উপর যবর এবং কাফ এর নিচে যের সহকারে) প্রসিদ্ধ, অথচ সঠিক উচ্চারণ 'সাকীনা' নয় বরং 'সুকাইনা' (সীন এর উপর পেশ এবং কাফ এর উপর যবর)। কারবালার ঘটনায় যে শাহজাদীর আলোচনা করা হয়, তিনি ছিলেন এই হযরত সুকাইনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا। যদি তাঁর সম্পর্কের ভিত্তিতে মেয়ের নাম রাখতে হয়, তবে 'সুকাইনা' রাখুন। তবে 'সাকীনা' নাম রাখাতেও কোনো অসুবিধা নেই, কারণ এটি কুরআনে করীমের একটি শব্দ, যার অর্থ হলো "শান্তি, প্রশান্তি এবং নিরাপত্তা"।

(মাদানী মুযাকারা, ৪ মুহাররমুল হারাম ১৪৪১ হিজরী)

দুইজন মরহুমের মৃত্যুবার্ষিকী একসাথে করা কেমন?

প্রশ্ন: যদি কারো বাড়িতে দুই মাসের ব্যবধানে পরপর দুইজন মারা যান, তবে কি তাঁদের মৃত্যুবার্ষিকী একসাথে করা যাবে?

উত্তর: জ্বি হ্যাঁ! একসাথে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করাতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ মৃত্যুবার্ষিকী হলো মূলত ইসালে সাওয়াব করা। যদি কেউ মৃত্যুবার্ষিকী না-ও করে তবে সে গুনাহগার হবে না, কিন্তু মৃত্যু বার্ষিকীকে নাজায়িয বলা ব্যক্তি গুনাহগার হবে, কারণ শরীয়ত মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে নিষেধ করেনি।

(মাদানী মুযাকারা, ৪ মুহাররমুল হারাম ১৪৪১ হিজরী)

"যদি দুনিয়ায় সবাই আমানতদার হতো তবে জান্নাত দুনিয়াতেই হতো" বলা কেমন?

প্রশ্ন: "যদি দুনিয়ায় সবাই আমানতদার হতো তবে জান্নাত দুনিয়াতেই হতো" এমন কথা বলা কেমন?

উত্তর: হতে পারে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; সর্বত্র শান্তি থাকত এবং মানুষ লুটতরাজ করত না, কাউকে কষ্ট দিত না এবং সবাই শান্তিতে বসবাস করত, তবে এমন হওয়াটা দুনিয়ায় জান্নাত হওয়ার মতো, যেমন; কাশ্মীরকে 'জান্নাতের উপত্যকা' বলা হয়। এই ধরণের বাক্যগুলো রূপক বা প্রবাদ হিসেবে বলা হয়ে থাকে।

(মাদানী মুযাকারা, ৭ মুহাররমুল হারাম শরীফ ১৪৪১ হিজরী)

বীজ বপনের সময় কীটনাশক ঔষধ দেওয়া কেমন?

প্রশ্ন: বীজ বপনের সময় কিট দমনের জন্য ঔষধ দেওয়া হয়, এতে কি গুনাহ হবে না?

উত্তর: জীবাণুনাশক ঔষধ বীজে দেওয়া যেতে পারে, এতে কোনো গুনাহ নেই।

(দেখুন: মাদানী মুযাকারা, ৬ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হিজরী)

সন্তানদের প্রতিটি বিষয়ে পিতা-মাতার হস্তক্ষেপ করা কেমন?

প্রশ্ন: সন্তানদের জীবনে পিতা-মাতার কতটুকু অধিকার রয়েছে, তাঁরা কি তাদের প্রতিটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন?

উত্তর: মা-বাবার কিছু আদেশ এমন, যা মানা ফরয, আবার কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতা থাকে। যেগুলো মানা ফরয সেগুলো না মানলে গুনাহগার হবে। আর যেসব বিষয় মানা ফরয নয় এবং শরীয়ত বিরোধীও নয়, সেগুলোও পালন করা উচিত এবং তাঁদের হস্তক্ষেপের বিষয়ে নিজের মন বড় রাখা উচিত। পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ হয়ে যান, তখন অনেক সময় তাঁদের হস্তক্ষেপ বেড়ে যায়; প্রকৃতপক্ষে তাঁরা পুরনো যুগ দেখেছেন, যার ফলে তাঁদের মনে হয় যে, বর্তমানের সন্তানরা ভুল করছে। তাঁরা ভাবেন; "আমাদের সময় তো এমন হতো না।" সুতরাং তাঁদের কঠোর কথাগুলো সহ্য করা উচিত, যেমনটি শৈশবে তাঁরা আমাদের সহ্য করেছিলেন।

(মাদানী মুযাকারা, ১৩ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হিজরী)

গুরুগম্ভীর ব্যক্তিদের দেখে কি মানুষ বিরক্ত হয়ে যায়?

প্রশ্ন: যারা গুরুগম্ভীর হয়ে থাকে, তাদের দেখে কি মানুষ বিরক্ত হয়?

উত্তর: প্রতিটি গুরুগম্ভীর মানুষই বিরক্ত করে না। যে ব্যক্তি গুরুগম্ভীর এবং নীরব থাকে কিন্তু মুচকি হাসে, তবে তার গাম্ভীর্য কাউকে কষ্ট দেয় না। মুফতি মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী এবং হাজী যমযম আত্তারীর স্বভাবে গাম্ভীর্যতা ছিল কিন্তু তাঁদের পাশে বসা ব্যক্তি বিরক্ত হতো না। আমি তাঁদের কাউকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে দেখিনি। (মাদানী মুযাকারা, ১০ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হিজরী)

বিয়ে ঠিক করার সময় ছেলেপক্ষের কাছ থেকে মেয়েপক্ষের টাকা নেওয়া কেমন?

প্রশ্নঃ কিছু এলাকা এমন আছে, যেখানে ছেলেপক্ষ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলে মেয়েপক্ষ পাঁচ লক্ষ বা দশ লক্ষ টাকা দাবী করে এবং মেয়েকে যৌতুক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা মতো জিনিসপত্র দেয়। প্রশ্ন হলো, মেয়েপক্ষের কি এভাবে টাকা নেওয়া জায়িয?

উত্তরঃ মেয়ে পক্ষের ছেলে পক্ষের থেকে এভাবে টাকা নেওয়া মানে মেয়েকে বিক্রি করার মতো। মেয়ে পক্ষ এভাবে যে টাকা নিচ্ছে তা হলো ঘুষ। একইভাবে বিদায়ের সময় যদি মেয়ের ভাই বলে যে, "এতো টাকা দিলে তবেই বোনকে বিদায় দেব", তবে এটিও ঘুষ। কিছু সম্প্রদায়ের সম্পর্কে শোনা গেছে যে, তারা এমনটা করে; আল্লাহ পাক নিরাপত্তা নসীব করুক। আমীন।

(দেখুনঃ মাদানী মুযাকারা, ৯ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হিজরী)

গুনাহ বৃদ্ধির কারণ হলো মৃত্যুকে ভুলে যাওয়া

প্রশ্নঃ গুনাহ বৃদ্ধির কারণ কি মৃত্যুকে ভুলে যাওয়া?

উত্তরঃ যখন মানুষ মৃত্যুকে ভুলে যায় তখন তার মাঝে দুঃসাহস তৈরি হয়। যখন কোনো ব্যক্তি গুনাহের কাজ করার জন্য পা বাড়ায়, তখন মৃত্যুর স্মরণ তাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে। তখন সে চিন্তা করবে যে, আমাকেও মরতে হবে; যদি এই গুনাহের কারণে কবরে আমাকে সাপ পেঁচিয়ে ধরে অথবা আগুন আমাকে ঘিরে নেয়, তবে আমি কী করব? গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হলো মৃত্যুকে স্মরণ করারই বরকত। মৃত্যুকে ভুলে যাওয়া এক বিশাল অবহেলা, আর এই অবহেলাই গুনাহ বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(মাদানী মুযাকারা, ১লা রবিউস সানি শরীফ ১৪৪২ হিজরী)

বিমানে খাবার খাওয়ার জন্য দেওয়া বাসনপত্র বাড়িতে নিয়ে যাওয়া কেমন?

প্রশ্নঃ যারা বিমানে সফর করেন তাদের বিমানের কর্মীরা খাবার দেয়, কিন্তু তারা খাওয়ার পর বাসনপত্র ফেরত চায় না। তবে কি সেই বাসনপত্র ভ্রমনকারী নিজের কাছে রাখতে পারে?

উত্তরঃ বিমানে ভ্রমনকারীদের যেসব বাসনে খাবার দেওয়া হয় সেগুলো সাধারণত দুই ধরণের হয়ে থাকে; হয়তো তা ওয়ানটাইম (Disposable) অথবা এমন যা ধুয়ে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতে পারে যে, কোন বাসনটি রাখার মতো আর কোনটি ফেলে দেওয়ার মতো। যে বাসনটি ফেলে দেওয়ার মতো নয়, তা নিয়ে যাওয়া গুনাহ।

(দেখুনঃ মাদানী মুযাকারা, ২০ যিলকাদতুল হারাম ১৪৪১ হিজরী)

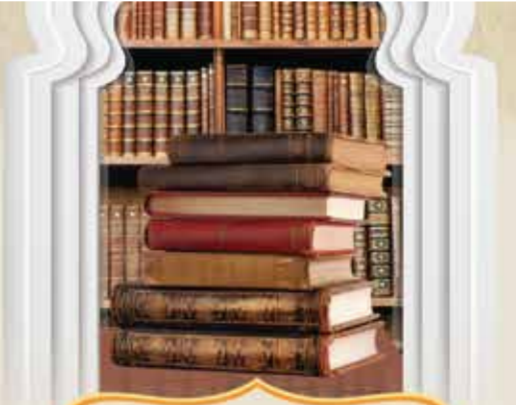

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

মুফতি ফুযাইল রযা আত্তারী

(১) কুরবানীর পশুর মালা ও রশির বিধান

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমাদের কুরবানীর পশুর গলায় একটি সাধারণ রশি এবং একটি পুতির মালা ছিল, যা কুরবানীর সময় রক্তে ভিজে গিয়েছিল, তাই আমরা সেগুলো ফেলে দিয়েছি। এরপর কেউ একজন দৃষ্টি আকর্ষণ করল যে, এগুলো সদকা করতে হয়। তো এখন কি আমাদের সেই রশি ও মালার মূল্য সদকা করতে হবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

কুরবানীর পশু আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, এর সম্মান ও মর্যাদার নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং যখন পশুকে ইসলামের নিদর্শনের সৌন্দর্যের নিয়তে সাজানো হয় এবং এই নিয়তও থাকে যে, পরবর্তীতে গরীব মুসলমানদের উপকার করার উদ্দেশ্যে সাজসজ্জার বস্তু যেমন; রশি ও মালা ইত্যাদি সদকা করব, তবে এখন নিজের এই নিয়তের উপর আমল করে তা সদকা করার নির্দেশ হবে। কেননা আল্লাহ পাকের সাথে ওয়াদা করে তা থেকে ফিরে আসা খুব খারাপ বিষয় কিন্তু সাধারণত আমাদের এখানে এই ধরণের নিয়তে পশুকে মালা ইত্যাদি পরানো হয় না। সুতরাং পশুকে মালা ইত্যাদি পরানোর সময় যদি আপনারও এমন কোনো নিয়ত না থেকে থাকে তবে সেই মালা বা এর মূল্য সদকা করা আপনার উপর শরীয়ত অনুযায়ী আবশ্যক নয়। একইভাবে রশির মূল্যের সদকাও আবশ্যক নয়, কারণ এই সাধারণ রশি যা দিয়ে পশু বাধা হয় বা পশুর নাক ও চেহারায় এবং গলার চারিপাশে থাকে তা পশুকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য নয় বরং হেফাযতের উদ্দেশ্যে থাকে। এই কারণেও এটি সদকা করার নির্দেশ নেই।

সতর্কবাণী: যদি সেই মালা বা রশি এমন হতো যা থেকে লাভবান হওয়া যেত অথবা তা বিক্রি করা যেত, তবে তা ফেলে দেওয়া জায়িয ছিল না। কারণ এটি সম্পদ নষ্ট করার অন্তর্ভুক্ত যা জায়িয নয়। সুতরাং এই অবস্থায় আপনার তাওবা করা আবশ্যক।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) শরয়ী ফকির ব্যক্তির জন্য ত্রুটিযুক্ত পশুর কুরবানীর বিধান

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নই। আমি কুরবানীর ঈদের

একদিন আগে কুরবানী করার জন্য একটি ছাগল কিনেছিলাম। পরে আমি জানতে পারলাম যে, সেই ছাগলটি চোখে একেবারেই দেখতে পায় না। কিন্তু এই ঈদে আমি সেই ছাগলটিই কুরবানী করে দিয়েছি। এখন জানার বিষয় হলো যে, এই পশুর কুরবানী হয়েছে কি না?

নোট: প্রশ্নকারী পশু কেনার সময়ও সাহিবে নিসাব ছিল না এবং কুরবানীর মান্নতও করেনি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

শরয়ী ফকিরের উপর কুরবানী আবশ্যক হয় না। কিন্তু সে যদি কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করে তবে তার ক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট পশুই কুরবানীর জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়, যদিও তাতে এমন কোনো ত্রুটি বা দোষ থাকে যা কুরবানীতে বাধা দেয়। সুতরাং জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যেহেতু আপনি সাহিবে নিসাব ছিলেন না কিন্তু কুরবানী করার নিয়তে ছাগল কিনেছেন, যদিও তা কিছুই দেখতে পেত না, তবুও তা কুরবানী করার মাধ্যমে কুরবানী আদায় হয়ে গেছে।

মনে রাখবেন! এই হুকুম শুধু শরয়ী ফকিরের জন্য। যদি কোনো ধনী ব্যক্তি এমন পশু ক্রয় করলো যা চোখে দেখে না, তবে সেই অবস্থায় ধনীর জন্য অন্য একটি সুস্থ পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। অন্ধ পশু জবাই করলে কুরবানী আদায় হবে না।

অনুরূপভাবে! যদি ফকির আগে থেকেই অনির্দিষ্ট কোনো পশু কুরবানীর মান্নত করে থাকে এবং মান্নত পূরণ করার জন্য সে এমন পশু ক্রয় করে যা অন্ধ, তবে সেই পশু জবাই করলে তার মান্নত পূরণ হবে না। কারণ অনির্দিষ্ট মান্নতের ক্ষেত্রে এমন পশু হওয়া আবশ্যক, যা কুরবানীর শর্তাবলী অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ হয়।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) কারেন্সি নোটের বিনিময়ে কয়েন লাভের ভিত্তিতে বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরীয়ত এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, নোটের বদলে নোটের কেনা-বেচা লাভ সহকারে নগদে জায়িয কিন্তু বাকিতে জায়িয নয়। এখন জিজ্ঞাসা হলো যে, যদি কয়েনকে নোটের বদলে বাকিতে বিক্রি করা হয় তবে কি এই ক্রয়-বিক্রয় জায়িয হবে কিনা? এটি সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে না তো?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে শরয়ী কানুন হলো যে, যখন দুটি জিনিসের স্বজাত ও ওজন এক হয় অর্থাৎ এই উভয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তবে কম-বেশি করা ও বাকিতে লেনদেন উভয়টিই সুদ ও হারাম। আর যখন উভয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না, তখন কম-বেশি ও বাকি উভয়টিই জায়িয। আর যখন একটি বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ শুধু স্বজাত অথবা শুধু ওজন পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না, তখন কম-বেশি করা জায়িয কিন্তু বাকিতে লেনদেন করা সুদ ও হারাম।

এই শরয়ী কানুন অনুযায়ী নোট এবং কয়েনের মধ্যে উভয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। প্রথমত এগুলো সমজাতীয় নয়, কারণ নোটের মৌল কাগজ আর কয়েনের মৌল বিভিন্ন ধাতু। দ্বিতীয়ত আমাদের লোকজ প্রথায় নোট ও কয়েন গণনার বস্তু হওয়ার কারণে এতে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য "ওজন বা পরিমাপ" পাওয়া যায় না। সুতরাং নোটের বদলে কয়েন ক্রয়-বিক্রয় যেমনিভাবে নগদে (অর্থাৎ উভয় পক্ষ থেকে একই মজলিসে কবজা হয়ে যাওয়া) জায়িয, তেমনি বাকিতেও (অর্থাৎ এক পক্ষ থেকে কবজা হলো অন্য পক্ষ থেকে হলো না) জায়িয। তবে যদি উভয় পক্ষ থেকেই বাকিতে হয় (কেউই গ্রহণ করল না) তবে তা নাজায়িয। কেননা এটি বাকির বদলে বাকি কেনা-বেচার অবস্থায়, যা হাদীস ও ফিকহ অনুযায়ী নাজায়িয ও হারাম।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৪) রুকু থেকে ভুলবশত "আল্লাহু আকবার" বলে উঠা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরীয়ত এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, ইমাম সাহেব নামাযে ভুল করে سمع الله لمن حمده এর জায়গায় "আল্লাহু আকবার" বলে ফেলেছেন এবং সিজদায়ে সাহুও করেননি। এই অবস্থায় নামায হয়েছে কিনা?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী সিজদায়ে সাহু ভুলবশত নামাযের কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে ওয়াজিব হয়। সুন্নাত ও মুস্তাহাব ত্যাগের কারণে ওয়াজিব হয় না। তবে এগুলো ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত ত্যাগের কারণে নামায পুনরায় পড়া মুস্তাহাব। আর রুকু থেকে উঠার সময় ইমামের জন্য سمع الله لمن حمده বলা সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। সুতরাং জিজ্ঞাসিত অবস্থায় নামায হয়ে গেছে, সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়নি। তবে এই নামায পুনরায় পড়া মুস্তাহাব।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ব্যবসার আহকাম

মুফতি আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

(১) দোকান তৈরি না হওয়া সত্ত্বেও বিল্ডার থেকে দোকানের ভাড়া নেওয়া

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমি একটি প্লাজায় নিজের জন্য একটি দোকান বুকিং দিয়েছিলাম এবং এর মূল্যও পরিশোধ করেছি। এখন চুক্তি অনুযায়ী দোকান দখল দেওয়ার সময় এসেছে, কিন্তু এখনও দোকানটি তৈরি হয়নি; সামান্য কিছু কাজ হয়েছে কিন্তু তা ব্যবহারের উপযোগী নয়, যার কারণে আমি দখল পাইনি। বিল্ডারকে দখল দেওয়ার কথা বলায় এবং তার উপর চাপ সৃষ্টি করায় সে বলছে যে, যতক্ষণ দোকানের দখল না দিতে পারছি ততক্ষণ মার্কেট রেট অনুযায়ী প্রতি মাসে আমার কাছ থেকে ভাড়া নিতে থাকুন। আমার প্রশ্ন হলো, যতক্ষণ সে দোকান তৈরি করে দখল না দিচ্ছে ততক্ষণ কি আমি ভাড়ার খাতে বিল্ডার থেকে টাকা নিতে পারি?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: জিজ্ঞাসিত পরিস্থিতিতে সময়মতো দোকান তৈরি করে না দেওয়ার কারণে বিল্ডার থেকে ভাড়ার খাতে টাকা নেওয়া জায়িয নেই। এখানে ভাড়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ ভাড়া কোনো জিনিসের ব্যবহারের বিনিময়ে হয়, কিন্তু এখানে উক্ত দোকানটি উপকার ভোগ করার উপযোগী নয় এবং এটি বিল্ডারের উদ্দেশ্যও নয়। যেকোনো আর্থিক আয়ের জন্য শরীয়ত সম্মত কারণ থাকা জরুরী, অথচ এখানে ভাড়ার নামে টাকা নেওয়ার শরীয়ত সম্মত কোনো কারণ নেই।

মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ হলো যে, উক্ত পরিস্থিতিতে ঘুষের দিকটি পাওয়া যাচ্ছে, কারণ নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতার নিকট দোকান বুঝিয়ে দেওয়া বিল্ডারের উপর আবশ্যক ছিল। এখন বিল্ডার কোনো কারণে দখল দিতে পারেনি, এমতাবস্থায় বিল্ডার ক্রেতাকে ভাড়ার খাতে টাকা দেওয়ার যে অফার করছে, তা নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য, যাতে মার্কেটে ঐ বিল্ডারের এবং তার প্রজেক্টের ভ্যালু বজায় থাকে; আর এটিই

হলো ঘুষ। সুতরাং জিজ্ঞাসিত পরিস্থিতিতে উক্ত টাকার লেনদেন করা নাজায়িয ও হারাম এবং বাতিল পদ্ধতিতে কোনো মুসলমানের সম্পদ ভোগ করার অন্তর্ভুক্ত।

এই হুকুম সেই পরিস্থিতিতে, যখন বিল্ডার নিজে থেকে এই অফার করে। কিন্তু বিল্ডার যদি নিজে থেকে অফার না করে বরং ক্রেতার পক্ষ থেকে উক্ত টাকা নেওয়ার দাবী থাকে, তবে তা আর্থিক জরিমানা হিসেবে গণ্য হবে; এভাবে যে, বিল্ডার সময়মতো দোকানের দখল দেয়নি, যার কারণে ক্রেতা বিল্ডারের কাছে ভাড়া দাবী করছে, আর আর্থিক জরিমানা নেওয়া জায়িয নেই।

হ্যাঁ, এতটুকু ঠিক যে, বিল্ডারের উপর দোকানের দখল দেওয়া শরীয়ত অনুযায়ী আবশ্যক ছিল, শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া যদি সে গড়িমসি করে তবে তা ঠিক নয়। আর যদি কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে দেরি করে তবে বিল্ডারকে অবকাশ দিতে হবে।

সতর্কবাণী: এটি তো ফিকহী সম্ভাবনার আলোকে উত্তর ছিল, কিন্তু পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, এই ধরণের স্কিমগুলো প্রতারক বিল্ডাররা দিয়ে থাকে, যারা কয়েক মাস ভাড়া দেওয়ার পর পালিয়ে যায়।

وَاللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَمُ وَصَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(২) মৃত হরিণ থেকে বের হওয়া মৃগনাভি (মুশক) বিক্রি করা এবং ব্যবহার করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, মৃত হরিণ থেকে বের হওয়া মৃগনাভি (মুশক) ক্রয়-বিক্রয় করা এবং তা ব্যবহার করা কেমন?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: মৃত হরিণ থেকে বের হওয়া মৃগনাভি বা মুশক ব্যবহার করা এবং তার ক্রয়-বিক্রয় করা শরীয়ত অনুযায়ী জায়িয, এতে কোনো অসুবিধা নেই।

এই মাসআলার বিস্তারিত হলো যে, পবিত্র শরীয়তের একটি মূলনীতি হলো; সেই বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় জায়িয যা থেকে উপকার অর্জন করা হালাল। শূকর ছাড়া অন্যান্য মৃত পশুর ঐ সকল অঙ্গ, যাতে রক্ত সঞ্চালিত হয় না, সেগুলো ব্যবহার ও কেনাবেচাতে কোনো সমস্যা নেই, যেমন; মৃত পশুর পেশি, চুল, শিং ও হাড় ইত্যাদি; কারণ এই অঙ্গগুলোতে প্রাণ থাকে না। সুতরাং এগুলোর ব্যবহার ও কেনাবেচা শরীয়ত অনুযায়ী জায়িয।

এই নিয়মে মৃত হরিণ থেকে বের হওয়া মৃগনাভি যদিও মৌলিক দিক থেকে অপবিত্র রক্ত ছিল, কিন্তু যখন তা নিজ সত্তা পরিবর্তন করে সুগন্ধিতে পরিণত হয়েছে এবং থলির মতো অবস্থা ধারণ করেছে, যাতে রক্ত সঞ্চালিত হয় না, তখন তা পবিত্র হয়ে গেছে। এখন এই মৃগনাভি ব্যবহার করা ও ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয, যদিও তা মৃত হরিণ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

"মারাকিল ফালাহ"তে রয়েছে:

(ونافجة المسک طاھرۃ) مطلقا۔۔۔

(کالمسک) للاتفاق علی طھارته

অনুবাদ: হরিণের মৃগনাভির থলিও মুশকের মতো নিরঙ্কুশভাবে পবিত্র, কারণ এর পবিত্রতার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে।

এর অধীনে "হাশিয়াতুত তাহতাবী"তে রয়েছে:

وقوله مطلقا يفسر بانها سواء كانت من ذكية،

او ميتة، او انفصلت من حية

অনুবাদ: লেখকের 'নিরঙ্কুশ' বলার ব্যাখ্যা হলো যে, চাই সেই মৃগনাভি জবাই করা হরিণ থেকে নেওয়া হোক, বা মৃত হরিণ থেকে, অথবা জীবন্ত হরিণ থেকে বিচ্ছিন্ন হোক (তা পবিত্র)।

(হাশিয়াতুত তহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ, পৃষ্ঠা: ১৭০)

وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) বিদ্যুতের হুক লাগানো বা তা মেরামত করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমি ইলেকট্রিকের কাজের সাথে জড়িত এবং মাঝেমধ্যে সাধারণ মানুষ আমাকে অবৈধ বিদ্যুতের সংযোগ লাগানোর জন্য অথবা আগে থেকে লাগানো সংযোগ মেরামতের কথা বলে। আমার জন্য কি অবৈধ বিদ্যুতের সংযোগ লাগানো বা তা মেরামত করা জায়িয?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: অবৈধ সংযোগ লাগিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা বেআইনি এবং শরীয়ত অনুযায়ী নাজায়িয কাজ, আর এই নাজায়িয কাজে সাহায্যকারী ও সহযোগী হওয়াও জায়িয নয়। কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে আমাদের নাজায়িয কাজে একে অপরের সহযোগিতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং জিজ্ঞাসিত অবস্থায় আপনার বিদ্যুতের অবৈধ সংযোগ লাগানো নিঃসন্দেহে একটি নাজায়িয কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করা, যা জায়িয নয় এবং এর থেকে অর্জিত আয়ও হালাল হবে না।

গুনাহের কাজে একে অপরের সহযোগিতা করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে মহান আল্লাহর ইরশাদ হলো:

﴿وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করোনা।

(পারা ৬, সূরা মায়েদা: ২)

বিদ্যুৎ চুরি সম্পর্কে ফাতাওয়ায়ে ফকিহে মিল্লাতে রয়েছে: "চুরি করে বিদ্যুৎ জ্বালানো নিষেধ, কারণ এতে সরকারকে ধোঁকা দেওয়া এবং আইন ভঙ্গ করা হয়। নিজেকে অপমানিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া এবং নিজের সম্মানকে ঝুঁকিতে ফেলা হয়। অথচ সম্মানের হেফাযত করা এবং লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।" (ফাতাওয়ায়ে ফকিহে মিল্লাত, ১/১৯২)

ফাতাওয়ায়ে বেরেলী শরীফে রয়েছে: "চুরি করে বিদ্যুৎ চালানো জায়িয নয় এবং এটি সততার পরিপন্থী।" (ফাতাওয়ায়ে বেরেলী, পৃষ্ঠা: ১০৪)

وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

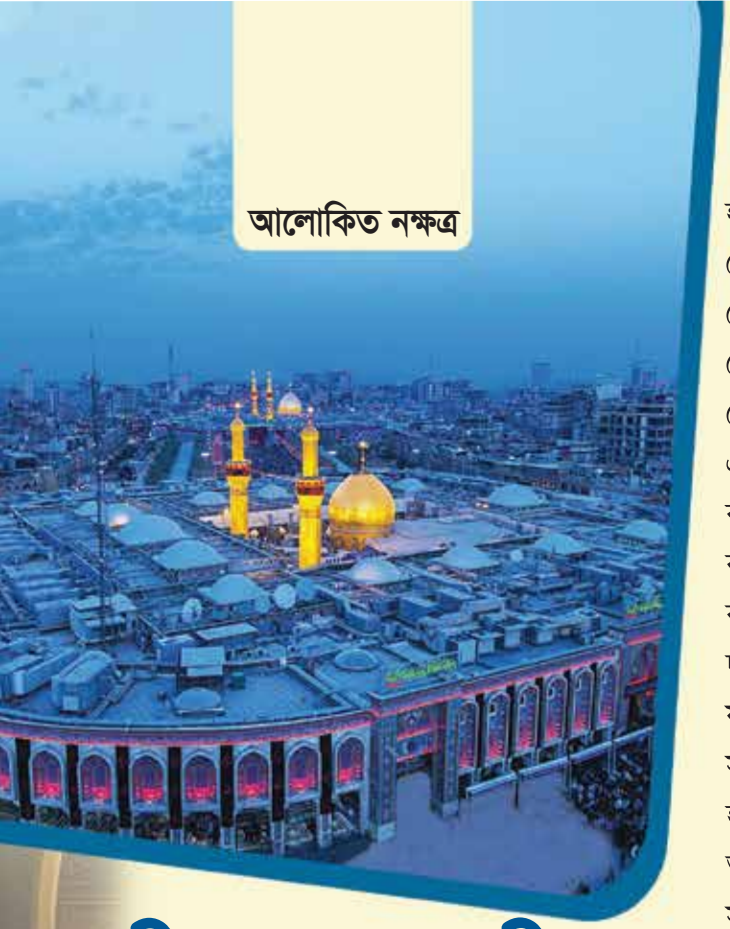

ইমাম হোসাইনের শিক্ষা এবং এর সমসাময়িক গুরুত্ব (পর্ব ০১)

মাওলানা ওমর ফাইয়ায আত্তারী মাদানী

সায়্যিদে কায়নাতের দৌহিত্র, শেরে খোদার কলিজার টুকরা হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন:

হে লোকেরা! সচ্চরিত্রে আগ্রহী হও, নেক আমলে প্রতিযোগিতা করো। যে ব্যক্তি কারো প্রতি অনুগ্রহ করেছে আর সে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি, তবে অনুগ্রহকারীকে আল্লাহ পাক বিনিময় দান করবেন। বিশ্বাস করো, নেক কাজে প্রশংসা হয় এবং সাওয়াব অর্জিত হয়। যদি তোমরা নেকীকে কোনো পুরুষের আকৃতিতে দেখতে পেতে, তবে তাকে অনেক সুন্দর ও লাবণ্যময় দেখতে, যা দর্শকদের ভালো লাগত। আর যদি তোমরা তিরস্কার ও মন্দকে দেখতে পেতে, তবে এক নিকৃষ্ট দৃশ্য দেখতে, যার প্রতি অন্তর ঘৃণা করত এবং দৃষ্টি নত হয়ে যেত। হে লোকেরা! যে বদান্যতা করে, সে সর্দার হয় এবং যে কৃপণতা করে, সে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়। সবচেয়ে বড় দানশীল সেই ব্যক্তি, যে এমন লোককে দান করে যার কোনো প্রত্যাশা ছিল না। সবচেয়ে পবিত্র ও সাহসী সেই ব্যক্তি, যে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়। সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি, যে সম্পর্ক ছিন্নকারী আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের প্রতি অনুগ্রহ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, আল্লাহ পাক কঠিন সময়ে তাকে এর বিনিময় প্রদান করেন এবং তার থেকে কঠিন বিপদ দূর করে দেন। যে ব্যক্তি নিজের মুসলমান ভাইয়ের দুনিয়াবী বিপদ দূর করে, আল্লাহ পাক তার থেকে আখিরাতের বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে কারো প্রতি অনুগ্রহ করে, আল্লাহ পাক তার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং অনুগ্রহকারীরা আল্লাহর প্রিয়। (নূরুল আবসার ফী মানাক্বিবি আ'লি বায়তিন নাবিয়্যিল মুখতার, পৃষ্ঠা: ১৫২, ১৫৩)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ফাতেমা যাহরার কলিজার টুকরো, সয়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁর পুরো জীবন ছিল কুরআন ও সুন্নাতের বাস্তব নমুনা। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কারবালার ময়দানে বাস্তবিকভাবেও সত্য

ও বাতিলের পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন এবং নিজের খুতবা ও বাণীর মাধ্যমে মৌখিকভাবেও উম্মতে মুসলিমাকে সেই দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। তাঁর এক মুবারক খুতবার একটি অংশ আমাদের সামনে রয়েছে, যাতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতা অবলম্বনের তাগিদ দিয়েছেন। এই নূরানী বাণীগুলো আজও ততটাই সজীব ও অর্থবহ, যতটা আজ থেকে চৌদ্দ শতাব্দী আগে ছিল।

আজ আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যেখানে নৈতিক মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে উপকারের জায়গা স্বার্থপরতা দখল করে নিয়েছে, যেখানে উদারতা ও মহানুভবতার পরিবর্তে কৃপণতা ও সংকীর্ণতা বাসা বেঁধেছে, যেখানে ক্ষমাকে দুর্বলতা মনে করা হয় এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার প্রেরণা ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এই খুতবা আমাদের জন্য এক মহান পথ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। আসুন! এই খুতবার প্রতিটি দিক আলাদা ভাবে বুঝি এবং নিজেদের চরিত্রকে যাচাই করি।

(১) সচ্চরিত্র এবং নেক আমলে দ্রুততা আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন

"হে লোকেরা! সচ্চরিত্রে আগ্রহী হও, নেক আমলে প্রতিযোগিতা করো (দ্রুততা অবলম্বন করো)।"

আজ আমাদের সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা হলো, আমরা চরিত্রকে দ্বীন থেকে আলাদা করে ফেলেছি। আমরা মসজিদে নামায পড়ি কিন্তু বাড়িতে এসে দুশ্চরিত্রতা প্রদর্শন করি। কুরআন তিলাওয়াত করি কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে দ্বিধা করি না। রোযা রাখি কিন্তু গীবত ও চুগলখোরী করতে থাকি। ইবাদতের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের চরিত্রে সেই নূর নেই, যা একজন মুসলমানের পরিচয় হওয়া উচিত।

নবীয়ে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اَكۡمَلُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اِيۡمَانًا اَحۡسَنُهُمۡ خُلُقًا

অর্থাৎ মুমিনদের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ ঈমানদার সেই, যে চরিত্রে সবার চেয়ে উত্তম।

(তিরমিযী, ২/৩৮৬, হাদীস: ১১৬৫)

(২) অনুগ্রহ এবং এর বিনিময়: খোদার গ্যারান্টি

"যে ব্যক্তি কারো প্রতি অনুগ্রহ করেছে আর সে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি, তবে অনুগ্রহকারীকে আল্লাহ পাক বিনিময় দান করবেন।"

আমাদের সমাজের একটি সাধারণ রোগ হলো; আমরা অনুগ্রহ এই জন্যই করি, যাতে মানুষ প্রশংসা করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আমাদের মনে রাখে। যখন কৃতজ্ঞতা পাওয়া যায় না তখন কল্যাণ করা বন্ধ করে দিই, বরং কখনো কখনো অনুগ্রহ প্রকাশ করে অন্যকে অপমানও করি। এই মানসিকতা শুধু ভুলই নয় বরং আমাদের নেক আমলকেও নষ্ট করে দেয়।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আপন দানকে নিষ্ফল করে দিওনা খোঁটা দিয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে। (পারা: ৩, সূরা: বাকারা: ২৬৪)

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর জীবন ছিলো অনুগ্রহের এক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ প্রত্যেক পরিস্থিতিতে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং বিনিময়ে কোনো কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা রাখেননি। কারবালায় যাওয়ার সময় যেসব লোক তাঁকে চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তারা পরে সঙ্গ ছেড়ে দেয়, কিন্তু তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাদের তিরস্কার বা অভিশাপ দেননি বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি তাওয়াক্কুল করেছেন। এটাই সেই প্রেরণা, যা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এই খুতবায় বর্ণনা করেছেন যে, অনুগ্রহ আল্লাহর জন্য করো, যদি সৃষ্টিজগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে তবে স্রষ্টা অবশ্যই বিনিময় দিবেন।

(৩) নেকীর সৌন্দর্য এবং মন্দের কলুষতা রূহানী দূরদৃষ্টি

"যদি তোমরা নেকীকে কোনো পুরুষের আকৃতিতে দেখতে, তবে তাকে অনেক সুন্দর ও লাবণ্যময় দেখতে পেতে এবং যদি তোমরা তিরস্কার ও মন্দকে দেখতে, তবে এক নিকৃষ্ট দৃশ্য দেখতে, যা অন্তর ঘৃণা করত এবং দৃষ্টি নত হয়ে যেত।"

এটিও আজকের একটি বিড়ম্বনা যে, আমরা নেকী ও মন্দের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছি। মিথ্যা বলাকে "চালাকি" বলি, ধোঁকা দেওয়াকে "ব্যবসায়িক দক্ষতা" মনে করি, গীবত করাকে "সত্য বলা" সাব্যস্ত করি এবং হারাম উপার্জনকে "যুগের প্রয়োজন" মনে করি। আমাদের ভেতর সেই রূহানী দূরদৃষ্টি শেষ হয়ে যাচ্ছে, যা মন্দকে মন্দের রূপেই চিনতে পারে।

কুরআনে মজীদে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: মানষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে এসব প্রবৃত্তির মায়া-মুহাব্বাত। (পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান: ১৪)

শয়তান মন্দ কাজকে সাজিয়ে উপস্থাপন করে, কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই ধোঁকায় পড়েন না। ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কারবালায় এজিদের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে বাস্তবে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁর দূরদৃষ্টি মন্দকে মন্দের রূপেই দেখে নিয়েছিল, যদিও তা ক্ষমতা এবং রাজকীয় শান-শওকতে মোড়ানো ছিল।

(বাকি অংশ আগামী মাসের সংখ্যায়। اِنْ شَآءَ اللّٰہ)

আপন বুযুর্গদের স্মরণ রাখুন

মাওলানা আবু মাজিদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী

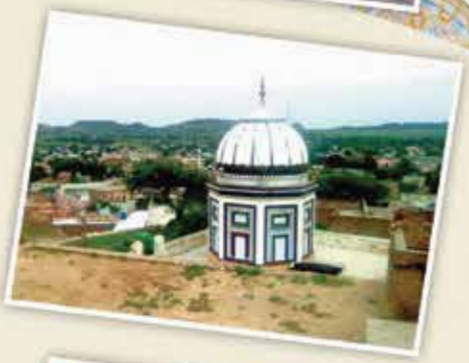

মুহাররমুল হারাম ইসলামী বছরের প্রথম মাস। এই মাসে যেসব সাহাবায়ে কিরাম, আউলিয়ায়ে এযাম এবং ওলামায়ে ইসলামের ওফাত বা ওরস রয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১১৬ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা "মাসিক ফয়যানে মদীনা" মুহাররমুল হারাম ১৪৩৯ হিজরী থেকে ১৪৪৭ হিজরী পর্যন্ত সংখ্যাগুলোতে করা হয়েছে। আরও ১২ জনের পরিচিতি লক্ষ্য করুন:

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان:

(১) হযরত আবু সাখর বুজাইর বিন বাজরা তাঈ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ: তিনি একজন মুজাহিদ ও কবি ছিলেন। ৯ হিজরীতে তিনি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সেই সৈন্য বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যা দুমাতুল জান্দাল এর শাসক উকিইদির এর দিকে গিয়েছিল। এই সৈন্য বাহিনী সফলতা লাভ করে এবং উকিইদিরকে বন্দী করে মদীনা মুনাওয়ারায় আনা হয়। তিনি সেই সময় কিছু কবিতা পাঠ করেন, যা শুনে নবীয়ে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে মুখের নিরাপত্তার দোয়া দেন। তিনি ৯০ বছর বয়সে কাদেসিয়ার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন, সেই সময়ও তাঁর সমস্ত দাঁত অক্ষত ছিল। (আল আসাবাহ, ১/৪০১, ৪০২)

(২) হযরত আবু উমর হারিস বিন মুদ্বারিস বিন আবদে যাররাহ আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ: তিনি বায়আতে হুদায়বিয়ায় (আসহাবে শাজার) এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনিও কাদেসিয়ার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি সন্তানের পিতা ছিলেন। (আল আসাবাহ, ১/৬৯১)

ওলামায়ে ইসলাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام:

(৩) ইমামুল হাদীস শায়খ আবু আমের কুবাইসাহ বিন উকবা কুফী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ: তিনি

জলীলুল কদর আইম্মায়ে দ্বীন যেমন; ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শু'বা বিন হাজ্জাজের ছাত্র এবং নির্ভরযোগ্য (সেক্বাহ) বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইমাম আবু বকর বিন শায়বা এবং ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারীর মতো মুহাদ্দিসগণ রয়েছেন। বুখারী শরীফে তাঁর থেকে বর্ণিত ৪৪টি হাদীস রয়েছে। তাঁর ওফাত মুহাররমুল হারাম ২১৫ হিজরীতে হয়। (তারিখে আওসাত লিল বুখারী, ২/৩৩৩, নাম্বার: ২৭৯১। তাহযীবুত তাহযীব, ৬/৪৭৮-৪৮০)

(৪) শায়খ আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন আবুল বাকা মুবারক শাফেয়ী বাগদাদী, যিনি আল্লামা ইবনুল খাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামে পরিচিত: তিনি ইমাম ও মুফতি, কিতাবুত তাম্বীহ এর ব্যাখ্যাকারক এবং বাগদাদের শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান ছিলেন। তাঁর জন্ম ৪৭৫ হিজরীতে এবং ওফাত মুহাররমুল হারাম ৫৫২ হিজরীতে হয়।

(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৫/৯৪, ৯৫)

(৫) শেহাবুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন শেখ আবুল আব্বাস আহমদ বিন আবু বকর কিত্তানী বুসাইরী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ: তাঁর জন্ম ৭৬২ হিজরীতে মিশরের গারবিয়া প্রদেশের বুসাইরে হয় এবং ১৮ বা ২৭শে মুহাররম ৮৪০ হিজরীতে মিশরের কায়রোতে ওফাত লাভ করেন। তিনি হাফিযে কুরআন ও ক্বারী, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানীর ছাত্র, ইলমে হাদীসে বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট লেখক, কায়রোর হোসাইনিয়া মহল্লার ইমাম, ফাযিল ও সালিহ ছিলেন। তিনি তিলাওয়াত ও ইবাদতে অত্যধিক লিপ্ত থাকতেন, নির্জনতাপ্রিয় এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনার মধ্যে রয়েছে; মিসবাহুয যুজাযাহ ফী যাওয়ায়িদে ইবনে মাজাহ এবং ইত্তিহাফুল খাইরাতিল মাহারাহ বি-যাওয়ায়িদিল মাসানিদিল আশারাহ।

(আদ দ্বাউল লামি', ১/২৫১, ২৫২। ইত্তিহাফুল খাইরাহ, ১/৯)

(৬) কুতবে ভেলোর হযরত মাওলানা সৈয়্যদ মহিউদ্দীন কাদেরী ভেলোরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ: তাঁর জন্ম সাদাতে গিলানিয়া বংশে ১২০৭ হিজরীতে হয় এবং মদীনা মুনাওয়ারায় ৩রা মুহাররম ১২৮৯ হিজরীতে ওফাত পান। তিনি একজন আলিম, আরিফ বিল্লাহ, শায়খে তরিকত এবং লেখক ছিলেন। ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের ভেলোর (Vellore) শহরের বিখ্যাত আলিম মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব ভেলোরী কাদেরী (প্রতিষ্ঠাতা: জামেয়া বাকিয়াতুস সালিহাত, ভেলোর) তাঁরই মুরীদ। (তাযকিরাতুল আনসাব, পৃষ্ঠা ২৪৩, ২৪৪)

(৭) মুফতি শেখ জামালুদ্দীন বাঞ্জারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ: তাঁর জন্ম ১২৩৮ হিজরীতে ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ কালিমান্তান প্রদেশের বাঞ্জার জেলার দালম পগারের এক ইলমী পরিবারে হয়। তিনি শেখ আরশাদ বাঞ্জারীর দৌহিত্র, ইসলামী জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ, ইন্দোনেশিয়া ও মক্কা মুকাররামার ওলামাদের ছাত্র, সুপ্রিম জজ এবং মুফতিয়ে দা'তু সারগী ছিলেন। তাঁর ওফাত ৮ই মুহাররম ১৩৪৮ হিজরীতে হয়। তাঁর মাযার ইন্দোনেশিয়ার উত্তর বাঞ্জার মাসিন এর "সারগী মুফতি" মহল্লায় অবস্থিত।

(উইকিপিডিয়া নিবন্ধ: Jamaluddin Al-Banjari)

আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام:

(৮) নূরী শাহ বাবা হযরত গাজী সৈয়্যদ নূর আলী শাহ শহীদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ: তিনি এক কামিল ওলি এবং সাহিবে তাসাররুফ বুযুর্গ ছিলেন। তিনি মুজাহিদে ইসলাম মুহাম্মদ বিন কাসিমের সৈন্য বাহিনীর সাথে সিরিয়া থেকে এখানে (সিন্ধু) তাশরীফ আনেন এবং ৫ই মুহাররম ৯৩ হিজরীতে শাহাদাত বরণ করেন। করাচীর জাহাঙ্গীর রোডের তিন হাট্টিতে অবস্থিত তাঁর মাযার সাধারণ মানুষের মিলনস্থল। (তাযকিরায়ে আউলিয়ায়ে সিন্ধু, পৃষ্ঠা: ৩৬৬)

(৯) মাখদুমুল মুলক হযরত খাজা আহমদ নূরী সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ: তাঁর জন্ম ৮৭০ হিজরীতে গাউস বাহাউদ্দীন জাকারিয়া মুলতানীর বংশে হয় এবং ৯৪৭ হিজরীতে ওফাত লাভ করে। তিনি জন্মগত ওলি, অত্যধিক ফয়েয দানকারী এবং খুবই প্রসিদ্ধ ওলি ছিলেন। তাঁর বংশধরের মধ্যে অনেক আউলিয়ায়ে কিরাম হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ঝিলাম জেলার পীর দা খারাও রয়েছেন। পাঞ্জাবের খুশাব জেলার পীল শরীফে তাঁর একটি চমৎকার রওযা রয়েছে, যেখানে প্রতি বছর ১লা মুহাররম ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

(খুশাব সরযমীনে আউলিয়া, পৃষ্ঠা: ১৪৮ থেকে ১৫১)

(১০) কুতবুল আকতাব সৈয়্যদ আলভী বিন মুহাম্মদ মওলা আদ দৌলাহ মুনফারমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ: তাঁর জন্ম ১১৬৬ হিজরীতে ইয়েমেনের তারিমে হয় এবং ৭ই মুহাররম ১২৬০ হিজরীতে ওফাত পান। তাঁর মাযার ভারতের কেরালা রাজ্যের মালাপ্পুরম জেলার তিরুরঙ্গাদির মুনফারম এলাকায় অবস্থিত। তিনি আলিম, ইসলামের মুবাল্লিগ, বা-আলভীয়া সিলসিলার শায়খে তরিকত, কামিল ওলি, স্বাধীনতা যুদ্ধের মুজাহিদ এবং মালাবারের বিশিষ্ট ওলামা ও মাশায়েখদের অন্যতম। উসমানীয় খেলাফতের জুফার (বর্তমান ওমান) অঞ্চলের গভর্নর শেখ ফজল পাশা তাঁরই সাহেবজাদা। (মিনহাতুল কুদ্দূসী বি-মাদহাতিস সায়্যিদ আলভী, পৃষ্ঠা: ৮, ১৬। উইকিপিডিয়া আরবি নিবন্ধ: علوي المنفرمي)

(১১) পীর সৈয়্যদ বেলায়েত শাহ জিলানী গোলড়ভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ: তাঁর জন্ম পাঞ্জাবের খুশাব জেলার ওয়াদী সোন সাকাইসারের নওশেরা নামক স্থানে হয় এবং ১৪ই মুহাররম ১৩৫৭ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন। তাঁর মাযার নওশেরার মিহরাল মহল্লায় অবস্থিত। তিনি হাফিযে কুরআন, সাহিবে ইলম, কিবলায়ে আলম পীর সৈয়দ মেহের আলী শাহর মুরীদ, সাহিবে কারামত এবং সর্বসাধারণের প্রিয়ভাজন ছিলেন।

(তাজাল্লিয়াতে মেহরে আনোয়ার, পৃষ্ঠা: ৯৮৭ থেকে ৯৯১)

(১২) খাদেমুল মিল্লাত হযরত পীর সৈয়্যদ খাদেম হোসাইন শাহ আলীপুরী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ: তাঁর জন্ম ১৩০৭ হিজরীতে আমীরে মিল্লাত সৈয়্যদ জামাআত আলী শাহ মুহাদ্দিস আলীপুরীর ঘরে হয় এবং ২১শে মুহাররাম ১৩৭১ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন। তিনি হাফিযে কুরআন, মুহাদ্দিস সুরতীর ছাত্র, কানপুর জামেউল উলূমের অধ্যক্ষ এবং কানপুরের বার্ষিক মিলাদুন্নবী মাহফিলের প্রতিষ্ঠাতা। পাঞ্জাবের নারোয়াল জেলার আলীপুর সায়্যিদানে আমীরে মিল্লাতের মাযারেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

(তাযকিরায়ে খেলাফায়ে আমীরে মিল্লাত, পৃষ্ঠা: ১৭২ থেকে ১৭৬)

ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসায়িল

মুফতি ফুযাইল রযা আত্তারী

(১) ওযুর সময় মাথায় লেগে থাকা মেহেদীর উপর মাসেহ করার শরয়ী বিধান

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, কোনো মহিলা যখন পুরো মাথায় মেহেদীর প্রলেপ দিয়ে রাখে এবং এরই মধ্যে নামাযের সময় হয়ে যায়, তবে মাথায় বিদ্যমান সেই মেহেদীর প্রলেপের উপর মাসেহ করা কি শরয়ীভাবে সঠিক?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

চুলের উপর মেহেদী লেগে থাকা অবস্থায় মাসেহ করার হুকুম হলো যে, যদি মেহেদীর প্রলেপ এতোটা ঘন হয় বা শুকিয়ে এতোটা শক্ত হয়ে গিয়ে থাকে যে, নিচে মাথার চামড়া বা চুল পর্যন্ত পানি পৌঁছাবে না, তবে এখন মেহেদীর উপরে মাসেহ করা সঠিক হবে না। অবশ্য যদি মেহেদীর প্রলেপ পাতলা হয় অথবা এর কোনো পুরু স্তর বিদ্যমান না থাকে, তবে বিধানের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, যদি মাসেহ করার সময় হাতের আর্দ্রতা পানিই থাকে এবং এতে মেহেদীর উপাদান এতোটা না মেশে, যা পানির সত্তাকে পরিবর্তন করে দেয়, তবে এই অবস্থায় মাসেহ সঠিক। আর যদি হাতের আর্দ্রতা মেহেদীর প্রভাবে এই পরিমাণ বদলে যায় যে, তাকে আর 'নিছক পানি' বলা যায় না, তবে এমন অবস্থায় মাসেহ সঠিক হবে না।

মনে রাখবেন যে, মাথা থেকে ঝুলে থাকা চুলের উপর মাসেহ করে নেওয়া যথেষ্ট নয়, এতে মাসেহ এর ফরয আদায় হয় না; বরং মাথার বিশেষ এক-চতুর্থাংশ (চার ভাগের এক ভাগ) পরিমাণ জায়গার উপর মাসেহ করা ফরয।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) নিফাসের পর পনের দিনের মধ্যে রক্ত আসার শরয়ী বিধান

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমার প্রথম সন্তানের জন্ম হলো এবং আমার ৪০

দিন রক্ত আসলো, এরপর বন্ধ হয়ে গেল। তখন আমি গোসল করে নামায পড়া শুরু করলাম। এরপর (রক্ত বন্ধ হওয়ার) ১৩তম দিনে আমার পুনরায় রক্ত আসা শুরু হলো, তখন আমি নামায ছেড়ে দিলাম। এই রক্ত দুই দিন অব্যাহত থেকে বন্ধ হয়ে গেল। এখন জানার বিষয় হলো যে, এই দুই দিনের নামাযের কাযা আছে কি না?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী দু'টি হায়েয ও নিফাস এবং হায়েযের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ণ পবিত্রতা অর্থাৎ কমপক্ষে পনের দিনের বিরতি থাকা জরুরী। যদি হায়েয বা নিফাস শেষ হওয়ার পর পনের দিন পূর্ণ হওয়ার আগেই রক্ত এসে যায়, তবে তা হায়েয নয়; বরং ইস্তেহাযা অর্থাৎ অসুস্থতার রক্ত। আর ইস্তেহাযা অবস্থায় নামায রোযা ক্ষমা হয় না।

এর আলোকে জিজ্ঞাসিত অবস্থায় নিফাস শেষ হওয়ার পর ১৩তম দিনে যে রক্ত এসেছে এবং যা দুই দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, তা ইস্তেহাযার রক্ত হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং ঐ দুই দিনের নামাযের কাযা করা ফরয। এছাড়া শরয়ী কারণ ছাড়া নামায কাযা করার কারণে আপনি গুনাহগারও হয়েছেন, এ জন্য তাওবা করাও আবশ্যক।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

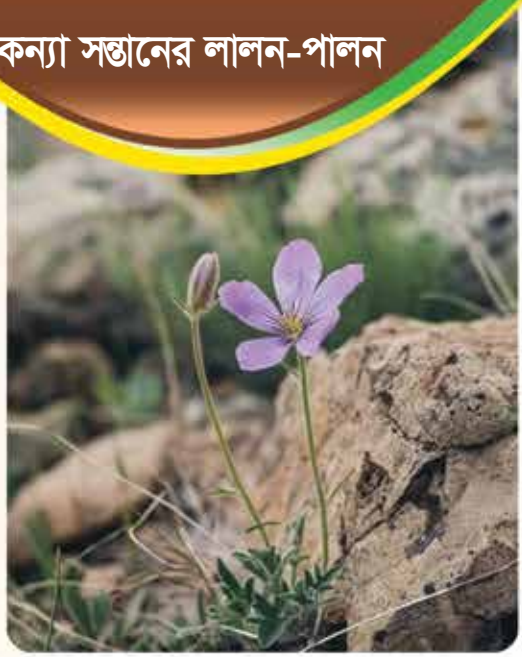

কন্যাদের ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দিন

উম্মে মিলাদ আত্তারীয়া

বড় থেকে বড় বিপদ ও পরীক্ষা শেষ হয়ে যায় এবং তিক্ত ভাষা মিষ্টি হয়ে যায়, কিন্তু এর জন্য ধৈর্যধারণ করতে হয়। ধৈর্য ও সহনশীলতা এমন এক হাতিয়ার, যার মাধ্যমে তুফানের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায় এবং কঠিন থেকে কঠিন সমস্যার সমাধান বের করা সম্ভব। ধৈর্য মানুষের ব্যক্তিত্বকেও ফুটিয়ে তোলে।

পুরুষ ও মহিলার জীবনে অনেক বিষয়ের ধরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। একইভাবে পেরেশানি ও বিপদে ধৈর্য ও সহনশীলতার ধরণও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এমন পরিস্থিতিতে কন্যাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উপর এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়।

মায়েরা নিজেদের কন্যাদের অল্প বয়স থেকেই পূর্ণ মনোযোগ, স্নেহ ও ভালবাসার সহিত ইতিবাচক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। কারণ শৈশবে শেখানো বিষয় মজবুত থাকে, যেমনটি হাদীস পাকে রয়েছে:

مَثَلُ الَّذِی یَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ فِیْ صِغَرِہٖ کَالنَّقْشِ عَلَی الْحَجَرِ

শৈশবে ইলম অর্জনকারীর উদাহরণ পাথরের নকশার মতো। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১/৩৩৩, হাদীস: ৫১৫)

ধৈর্যের গুরুত্ব এবং ধৈর্য অবলম্বনের মানসিকতা তৈরির জন্য প্রথমে কন্যাকে বলুন যে, 'ধৈর্য' হলো থামা, অবস্থান করা বা বিরত থাকার নাম এবং নফসকে সেই বিষয়ে বিরত রাখা (অর্থাৎ অটল থাকা) যার উপর বিরত থাকার (অটল থাকার) দাবী বিবেক ও শরীয়ত করছে, তাই ধৈর্য। ধৈর্য দুই প্রকার: প্রথমটি শারীরিক ধৈর্য, যেমন; শারীরিক পরিশ্রম সহ্য করা এবং এর উপর অটলতা বজায় রাখা। দ্বিতীয়টি হলো; স্বভাবজাত চাহিদা এবং নফসের আকাঙ্ক্ষা থেকে ধৈর্য ধরা। (সীরাতুল জিনান, পারা ২, সূরা বাকারা, ১৫৩ নং আয়াতের পাদটীকা, ১/২৭৯) কুরআনে মজীদে রয়েছে:

﴿وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ(۴۶)﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ধৈর্যধারণ করো। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (পারা: ১০, সূরা আনফাল: ৪৬)

কন্যাকে বলুন যে, মুসলমানের জন্য ধৈর্যের মাঝে বিরাট কল্যাণ রয়েছে, আল্লাহ পাক মুসলমানের জন্য মঙ্গলই মঙ্গল রেখেছেন। হাদীস

পাকে রয়েছে: মুমিনের বিষয়টি কতই না বিস্ময়কর যে, তার জন্য প্রতিটি বিষয়ে কল্যাণই কল্যাণ; যদি সে সুখ লাভ করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তবে তা তার জন্য কল্যাণ, আর যদি বিপদ আসে এবং তাতে ধৈর্য ধরে তবে তা তার জন্য মঙ্গল। (মুসলিম, পৃষ্ঠা ১২২২, হাদীস: ৭৫০০)

আমাদের জীবনে যে সকল বিপদ আসবে, সেই সময় আমাদের নামায ছাড়া যাবে না, ধৈর্যের আঁচল ছাড়া যাবে না। বরং আমাদের দেখতে হবে যে, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনে কেমন সব বেদনাদায়ক মুহূর্ত এসেছিল কিন্তু তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা ধৈর্যধারণ করেছেন, যেমনটি:

(১) যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কায় ইসলামের দাওয়াত শুরু করেন তখন কাফেররা তাঁকে অস্বীকার করে, বিদ্রূপ করে, এমনকি শারীরিক কষ্টও দেয়। কিন্তু তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো প্রতিশোধ নেননি বরং সর্বদা ধৈর্য ও কোমলতার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এটি কন্যাদের জন্য শিক্ষা যে, কঠিন পরিস্থিতিতেও চরিত্র এবং সাহস হারানো উচিত নয়। (২) তিন বছর পর্যন্ত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শিয়াবে আবি তালিবে তীব্র ক্ষুধা, পিপাসা ও সংকট সহ্য করেছেন। খাওয়ার মতো কিছু থাকত না, শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদত, কিন্তু তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহর উপর ভরসা এবং ধৈর্যের পথ ছাড়েননি। এই উদাহরণ শেখায় যে, পরীক্ষা ক্ষণস্থায়ী হয়, ধৈর্যশীলদের জন্য সহজতা অবশ্যই আসে। (৩) যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তায়েফে তাশরীফ নিয়ে যান, তখন সেখানকার লোকেরা শুধু দাওয়াতই প্রত্যাখ্যান করেনি বরং তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করেছে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বদ-দোয়া করার পরিবর্তে তাদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করেন। এটি কন্যাদের শেখায় যে, যদি কখনো আপনার জায়িয কথা ও দাবী না মানা হয়, তবে ধৈর্যধারণ করুন এবং কষ্টদানকারীদের জন্যও কল্যাণ কামনার প্রেরণা রাখা উচিত। (৪) যখন মক্কা বিজয় হলো তখন সেই সব লোক যারা বছরের পর বছর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দিয়েছে, তারা তাঁর সামনে অসহায় দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: "আজ তোমাদের উপর কোনো পাকড়াও নেই।" এটি উচ্চ পর্যায়ের ধৈর্য ও সহনশীলতার উদাহরণ যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নেওয়া। আপনারা স্বচ্ছল হয়ে গেলে যারা দুর্বল অবস্থায় আপনাদের কষ্ট দিয়েছিল তাদের উপর প্রতিশোধ স্বরূপ কষ্ট দিবেন না। (৫) নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিতা বিবিগণ ঘরে কখনো কখনো অনেক দিন পর্যন্ত চুলা জ্বলত না। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: এমনও হতো যে, দুই দুই মাস অতিবাহিত হয়ে যেত কিন্তু ঘরে আগুন জ্বলত না, শুধু খেজুর ও পানির উপর দিন কাটত। তা সত্ত্বেও সম্মানিতা বিবগণ কখনো কোনো অভিযোগ করেননি বরং ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও অল্প তুষ্টির সাথে জীবন অতিবাহিত করেছেন। এই উদাহরণ কন্যাদের শেখায় যে, অভাব ও কম-বেশি হওয়া জীবনের অংশ, প্রকৃত সফলতা হলো মানুষ প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে, আল্লাহর উপর ভরসা রাখে এবং অকৃতজ্ঞতা থেকে বেঁচে থাকে।

ইসলামের পয়গম্বরগণ এতিমদের রক্ষক

দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযি মজলিশে শূরার নিগরান
মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী

এতিমদের রক্ষক:

আমাদের প্রিয় নবী রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়ত ঘোষণার আগেও দুর্বল ও অসহায় মানুষের সাহায্য করতেন। নবুয়ত ঘোষণার পর তো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধুমাত্র তাঁর বাণীর মাধ্যমেই এতিমদের পক্ষাবলম্বন ও উৎসাহ দিতেন না বরং তাঁর মুবারক আমলের মাধ্যমেও এতিমদের তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতেন। যেমন; একবার আবু জেহেল এক এতিমের লালন-পালনের যিম্মাদারী নিয়েছিল। একদিন সেই বিপর্যস্ত এতিম আবু জেহেলের কাছে আসলো এবং নিজের সম্পদ থেকে কিছু চাইল। আবু জেহেল তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। কুরাইশরা সেই এতিমকে নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট পাঠিয়ে দিল, যাতে সে গিয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে ফরিয়াদ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বিদ্রূপ করা, কিন্তু এতিম শিশুটি তাদের কু-মতলব সম্পর্কে বেখবর ছিল। সে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট ফরিয়াদ জানালো, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই এতিমের সাথে আবু জেহেলের কাছে গেলেন। সে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখা মাত্রই এতিমের সম্পদ সাথে সাথে তাকে বুঝিয়ে দিল। কুরাইশরা আবু জেহেলকে তিরস্কার করল যে, তুমি কি তোমার দ্বীন থেকে ফিরে গেছ? আবু জেহেল উত্তর দিল: খোদার শপথ! আমি আমার দ্বীন থেকে ফিরে যাইনি, আসল কথা হলো: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ডানে ও বামে একটি বর্শা দেখেছি এবং আমার ভয় হচ্ছিল যে, যদি আমি তাঁর কথা না মানি তবে এই বর্শা আমাকে চিরে ফেলবে।

(তাফসীরে কবীর, ১১/৩০১, সূরা মাউন, ১ম আয়াতের পাদটীকা)

হযরত বশীর বিন আকরাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, আমি আরয করলাম: আমার বাবার কী হলো? তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তিনি শহীদ হয়ে গেছেন, আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি দয়া করুন। আমি এটি শুনে কাঁদতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে কাছে ডেকে নিলেন,

আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমাকে নিজের সাথে বাহনে বসিয়ে ইরশাদ করলেন:

اَمَا تَرْضٰى اَنْ اَكُوْنَ اَنَا اَبُوْكَ وَتَكُوْنَ عَائِشَةُ اُمُّكَ؟

অর্থাৎ তুমি কি এতে খুশি নও যে, আমি তোমার পিতা এবং আয়েশা তোমার মা হয়ে যাই?

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮/২৯৫, হাদীস: ১৩৫১৭)

অনুরূপভাবে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতিম ও বিধবাদের পাশে দাঁড়াতেন। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জলীলুল কদর সাহাবী হযরত আসআদ বিন যুরারাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ইন্তিকালের পর তাঁর কন্যাদের অত্যন্ত স্নেহ ও ভালবাসার সহিত লালন-পালন করেছেন। তিনি সেই কন্যাদের সোনার চমৎকার কানের দুল পরিয়েছিলেন যাতে দামী মুক্তা খচিত ছিল।

(তাবক্বাত ইবনে সাদ, আসআদ বিন যুরারাহ, ৩য়: খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৫৮)

سُبْحٰنَ اللهُ! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেমন আপন করে নেওয়ার এবং কী পরিমাণ স্নেহ ও মমতার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। নিশ্চিতভাবে কোনো এতিমের প্রতি করা এই অনুগ্রহ ও কল্যাণের ঘটনা আপন মহিমায় উজ্জ্বল। এটিই বাস্তবতা যে ইসলাম এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই এতিমদের আশ্রয়স্থল এবং রক্ষক ও অভিভাবক, যিনি এভাবে নিজের অনুসারীদের শিক্ষা দিচ্ছেন।

এতিম এবং নবীর হাদীস:

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন কোন পদ্ধতিতে এতিমদের সাহায্য করার ও তাদের অধিকার আদায়ের উৎসাহ দিয়েছেন, যাতে মানুষ শুধুমাত্র তাদের করুণার পাত্র মনে করে সাহায্য না করে বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, নিজের গুনাহ ক্ষমা করানো, উচ্চ মর্যাদা লাভ, নিজের আখিরাত সংশোধন এবং জান্নাতে প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার জন্য এতিমদের সাথে সদ্ব্যবহার করে। নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো ঘরের ভালো বা মন্দ হওয়ার মানদণ্ডও এতিমের সাথে করা আচরণকে সাব্যস্ত করেছেন। যেমনটি ইরশাদ করেন:

خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ،

وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ

অর্থাৎ মুসলমানদের ঘরের মধ্যে সর্বোত্তম ঘর সেটি, যাতে কোনো এতিম রয়েছে, যার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয় এবং মুসলমানদের ঘরের মধ্যে নিকৃষ্টতম ঘর সেটি, যাতে কোনো এতিম রয়েছে, যার সাথে মন্দ ব্যবহার করা হয়।

(ইবনে মাজাহ, ৪/১৯৩, হাদীস: ৩৬৭৯)

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: এতিমের সাথে আচরণের অনেক ধরণ রয়েছে, তার লালন-পালন, তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, তাকে দ্বীনদার নামাযী বানানো, সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা নিজের সন্তানের সাথে যে আচরণ করা হয়, তা এতিমের সাথে করা উচিত (এবং) মন্দ আচরণের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়গুলোর বিপরীত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। (মিরাতুল মানাজীহ, ৬/৫৬২)

অন্য একটি হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে: যে কেউ শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য এতিমের মাথায় হাত বুলাবে, তবে তার হাত

যতগুলো চুলের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, প্রতিটি চুলের বিনিময়ে তার জন্য নেকী রয়েছে। আর যে কেউ কোনো এতিম মেয়ে বা এতিম ছেলের প্রতি অনুগ্রহ করবে, আমি এবং সে জান্নাতে (দুই আঙুল মিলিয়ে ইরশাদ করলেন) এভাবে থাকব। (মুসনাদে আহমদ, ৮/২৭২, হাদীস: ২২২১৫) এই সাওয়াব তো শুধু হাত বুলানোর জন্য, যে তার পেছনে সম্পদ ব্যয় করবে, তার খেদমত করবে, তাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিবে, ভেবে দেখুন তার সাওয়াব কত হবে! এতিমকে নিজের সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করানো শুধু বরকতের মাধ্যমই নয় বরং খাবারের শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার উপায়ও বটে। যেমনটি হযরত সয়্যিদুনা আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে নবীয়ে রহমত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

مَا قَعَدَ يَتِيمٌ مَعَ قَوْمٍ عَلَى قَصْعَتِهِمْ،

فَيَقْرَبُ قَصْعَتَهُمْ شَيْطَانٌ

যে দস্তরখানায় এতিম (খাবারে অংশগ্রহণকারী) হয় শয়তান সেই দস্তরখানার কাছে যায় না। (মুজামুল আওসাত, ৫/২৩০, হাদীস: ৭১৬৫)

অন্তরের কঠোরতা দূর করার পদ্ধতি:

এতিমের মাথায় হাত বুলানোর দ্বারা নেকী অর্জনের পাশাপাশি অন্তরের কঠোরতা দূর হয় এবং প্রয়োজনও পূর্ণ হয়। যেমনটি হযরত সয়্যিদুনা আবু দরদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে নিজের অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করল। তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কি চাও তোমার অন্তর নরম হোক এবং তোমার প্রয়োজনগুলো পূর্ণ হোক? তবে তুমি এতিমের প্রতি দয়া করো এবং তার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও এবং তাকে তোমার খাবার থেকে খাওয়াও, এমনটি করলে তোমার অন্তর নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজনগুলো পূর্ণ হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮/২৯৩, হাদীস: ১৩৫০৯) বর্তমানেও আমাদের সমাজে এতিমরা বিদ্যমান এবং আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা তাদের জন্য নিরাপত্তা ও ভালোবাসা নিশ্চিত করা। আসুন! আমরা সবাই মিলে এতিমদের অধিকার ফুটিয়ে তুলি, এতিমদের সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিই এবং নিজের আমলের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করি। কেননা যে এতিমের সাথে সহমর্মিতা দেখালো, সে আল্লাহ পাকের নৈকট্য পাবে, তার অন্তর নরম হবে এবং তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

অন্তরের ময়লা

মাওলানা হায়দার আলী মাদানী

নোমান ভাই! আমার রেজিস্ট্রার থেকে পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নেওয়ার আগে আপনার উচিত ছিল আমাকে জিজ্ঞেস করা। উসাইদ রযা হাতে রেজিস্ট্রার ধরে বলছিলেন।

নোমান: আরে, মাত্র একটা পৃষ্ঠারই তো ব্যাপার, আপনি তো এমনভাবে কাঁদছেন যেন আমি পুরো রেজিস্ট্রার নিয়ে নিয়েছি।

উসাইদ রযা উত্তর দিতেই যাচ্ছিলেন এবং দুই বাচ্চার তর্ক হয়ত আরও চলত, কিন্তু এরই মধ্যে বেলাল স্যার দরজার কাছে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সবার আগে মুয়াবিয়ার নযর তাঁর উপর পড়ল এবং সে দ্রুত দুই বাচ্চাকে স্যারের দিকে মনোযোগ দেয়ার কথা বলে থামতে বলল।

বেলাল স্যার উচ্চস্বরে সালাম দিয়ে নিজের চেয়ারের কাছে এলেন এবং দরুদ শরীফ পড়ার পর সব বাচ্চাকে নিজের নিজের জায়গায় বসতে বললেন। তারপর মুয়াবিয়াকে বললেন: সকাল সকাল তোমরা এটাকে কি মাছের বাজার বানিয়ে রেখেছ?

মুয়াবিয়া: না স্যার! শুধু নোমান ভাই আর উসাইদ ভাই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছিলেন।

বেলাল স্যার: জি নোমান বাবা! কারণ কী? তোমরা দুজন তো আমাদের ক্লাসের বুদ্ধিমান বাচ্চাদের মধ্যে অন্যতম।

নোমান: স্যার, আজ ম্যাথ টেস্ট আছে আর আমি পেপার শিট আনতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই উসাইদ ভাইয়ের রেজিস্ট্রার থেকে পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়েছিলাম। আর তিনি আসতেই আমার সাথে ঝগড়া শুরু করে দিলেন, যত সব কৃপণ! একটা পৃষ্ঠা নিলে কী হয়? আমি কাল সকালে তাকে পুরো দশটা শিট এনে দেব।

জি উসাইদ বাবা! তুমি কী বলো? বেলাল স্যার উসাইদ রযাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে দাঁড়িয়ে বলল: স্যার! আমি ঝগড়া শুরু করিনি।

আমি শুধু এজন্য নিষেধ করছিলাম যে, রেজিস্ট্রার থেকে এভাবে পৃষ্ঠা ছিঁড়লে তা লুজ হয়ে যায়। আর সে আমাকে অন্তত জিজ্ঞেস তো করতে পারত! আমার কাছে এক্সট্রা শিট রাখা ছিল, আমি সেখান থেকেই দিয়ে দিতাম।

বেলাল স্যার কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ ছাড়াই চুপচাপ দুজনের কথা শুনলেন। কারণ তাঁর মতে, এতে সমস্যাটা স্পষ্টভাবে সামনে চলে আসে এবং তা আরও ভালোভাবে সমাধান করা যায়। তাই এখন তিনি তাঁর কথা শুরু করলেন:

নোমান বাবা! আমার মনে হয় উসাইদ ঠিক বলছে। তোমার আসলেই তাকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া উচিত ছিল। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম রেজিস্ট্রার নষ্ট হওয়ার বিষয় না থাকলেও, এভাবে না বলে নেওয়াটা একদমই ঠিক পদ্ধতি নয়। আর তারপর নিজে ভুল করার পরেও তাকে কৃপণ বলছ। এটা তো সেই প্রবাদের মতো হয়ে গেল, 'চোরের মায়ের বড় গলা।' এই কথায় বাচ্চারা হাসতে লাগল।

আমি তোমাকে চোর বলছি না, কিন্তু মনে রেখো! কারোর কোনো জিনিস তার অনুমতি ছাড়া একদমই ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এটি বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে কঠিন হিসাব নেবেন। আমাদের বুযুর্গরা বান্দার হকের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এসো, তোমাদের একটি ঘটনা শোনাই:

একজন বিখ্যাত তাবেয়ী বুযুর্গ ছিলেন, তোমরা সবাই নিশ্চয়ই তাঁর নাম শুনেছ; হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ । তাবেয়ী কাদের বলে তোমরা জানো তো?

নোমান: জি জি স্যার! মনে আছে। আপনিই বলেছিলেন যে, তাবেয়ী তাঁরা, যাঁরা মুসলমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোনো সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুসলমান হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

বেলাল স্যার: সাবাশ বাবা! এর মানে হলো আমার কথাগুলো তোমরা মনে রাখো। আচ্ছা, তো ইমাম আবু হানিফা অনেক বড় আলিম হওয়ার পাশাপাশি একজন ব্যবসায়ীও ছিলেন। তাই লোকেরা তাঁর কাছ থেকে ঋণ অর্থাৎ ধারও নিত। একবার তিনি তাঁর এক ঋণগ্রহীতা অগ্নিপূজকের কাছে ঋণ আদায় করার জন্য গেলেন। ঘটনাক্রমে তার বাড়ির কাছে তাঁর জুতোয় কাদা লেগে গেল। কাদা ছাড়ানোর জন্য তিনি যখন জুতো ঝাড়লেন, তখন কিছু কাদা ছিটকে ওই অগ্নিপূজকের দেয়ালে লেগে গেল।

এখন তিনি চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন যে, কী করব? কাদা পরিষ্কার করতে গেলে দেয়ালের মাটিও উঠে আসবে, আর পরিষ্কার না করলে দেয়ালটা নষ্ট হচ্ছে। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যেই তিনি অগ্নিপূজকের দরজায় কড়া নাড়লেন। অগ্নিপূজক বাইরে এসে যখন ইমামে আযমকে দেখল, সে খুব চিন্তিত হলো যে, ঋণ ফেরত দেওয়ার মতো টাকা তার কাছে নেই, তাই সে অপারগতা পেশ করতে

লাগল। কিন্তু ইমামে আযম তো নিজের চিন্তাতেই মগ্ন ছিলেন, তাই সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে তাকে দেয়ালে কাদা লেগে যাওয়ার কথাটি জানিয়ে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন: আমাকে বলুন, আপনার দেয়াল কীভাবে পরিষ্কার করব?

খোদাভীতি এবং এমন উচ্চতর চরিত্র দেখে সেই অগ্নিপূজক ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। যেন অগ্নিপূজক বলছিল: হযরত! দেয়ালের কাদা পরিষ্কার করার আগে আমার অন্তর কুফরির কাদা থেকে পবিত্র ও পরিষ্কার করে দিন।

(তাফসীরে কবীর, ১/২০৪)

স্যারের কথা শেষ হলে নোমান চট করে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং হাত জোড় করে বলতে লাগল: উসাইদ ভাই, সরি! ভবিষ্যতে আপনার কোনো জিনিস অনুমতি ছাড়া নেব না। আর আমি আপনাকে কৃপণও বলেছি, প্লিজ আমাকে মন থেকে ক্ষমা করে দেবেন।

আরে নোমান ভাই! হাতজোড় করবেন না, আমি আপনাকে মন থেকে ক্ষমা করে দিলাম। উসাইদ রযা নোমানের হাত ধরে বলল এবং বেলাল স্যারের সাথে সাথে পুরো ক্লাস হেসে উঠল।

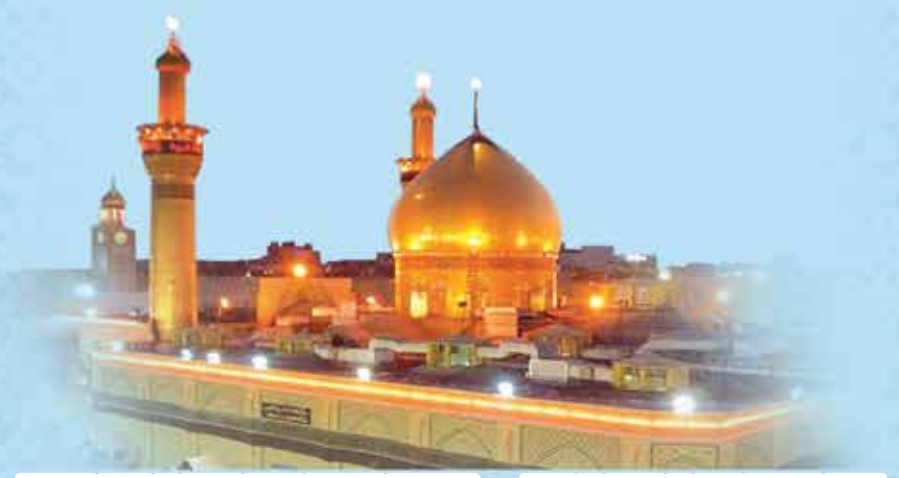

মুহাররমুল হারামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

তারিখ/মাস/সাল	নাম/ঘটনা	আরও তথ্যের জন্য পড়ুন
১লা মুহাররমুল হারাম ২৪ হিজরী	মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ওরস মোবারক	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররমুল হারাম ১৪৩৯ থেকে ১৪৪৬ হিজরী এবং "ফয়যানে ফারুকে আযম"
১লা মুহাররমুল হারাম ৪৮৬ হিজরী	শায়খুল ইসলাম হযরত আবুল হাসান আলী বিন আহমদ হাক্কারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ওরস মোবারক	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররমুল হারাম ১৪৩৯ হিজরী
১লা মুহাররমুল হারাম ৬৩২ হিজরী	হযরত শায়খ শেহাবউদ্দীন ওমর সোহরাওয়ার্দী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ওরস মোবারক	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররমুল হারাম ১৪৩৯ হিজরী
২রা মুহাররমুল হারাম ২০০ হিজরী	হযরত শায়খ মারুফ কারখী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররমুল হারাম ১৪৩৯ হিজরী
৫ই মুহাররমুল হারাম ৬৬৪ হিজরী	হযরত বাবা ফরিদউদ্দীন মাসুদ গঞ্জে শকর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ওরস মোবারক	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররমুল হারাম ১৪৩৯ হিজরী এবং "ফয়যানে বাবা ফরিদ গঞ্জে শকর"
১০ই মুহাররমুল হারাম ৬১ হিজরী	রাসূলে পাকের নাতি হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহাদাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররমুল হারাম ১৪৩৯ থেকে ১৪৪৬ হিজরী এবং "ইমাম হোসাইনের কারামত"

১০ই মুহাররমুল হারাম ১১৪২ হিজরী	হযরত সৈয়্যদ বরকতউল্লাহ মারহরাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররমুল হারাম ১৪৩৯ হিজরী
১২ই মুহাররমুল হারাম ৫১৩ হিজরী	মুরশিদে গাউসে আযম, হযরত আবু সায়িদ মুবারক মাখযুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররমুল হারাম ১৪৪০ হিজরী
১৪ই মুহাররমুল হারাম ১১৯৮ হিজরী	হযরত সৈয়্যদ শাহ হামযা মারহরাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররমুল হারাম ১৪৩৯ হিজরী
১৪ই মুহাররমুল হারাম ১৪০২ হিজরী	শাহজাদায়ে আলা হযরত, মুফতিয়ে আযম হিন্দ, মুফতি মুহাম্মদ মোস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররমুল হারাম ১৪৩৯, ১৪৪৪ হিজরী এবং "জাহানে মুফতিয়ে আযম হিন্দ"
১৮ই মুহাররমুল হারাম ১৪২৭ হিজরী	মরহুম রুকনে শূরা, হাফেয মুফতি মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররমুল হারাম ১৪৩৯, ১৪৪১ হিজরী এবং "মুফতিয়ে দাওয়াতে ইসলামী"
১৯শে মুহাররমুল হারাম ৮৫৩ হিজরী	আরিফে রাব্বানী হযরত সৈয়্যদ আহমদ জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররমুল হারাম ১৪৩৯ হিজরী
২৫শে মুহাররমুল হারাম ১৪১৯ হিজরী	হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সালাম কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত দিবস	ফয়যানে মাওলানা আব্দুস সালাম কাদেরী
মুহাররমুল হারাম ১৪/১৫ হিজরী	"কাদেসিয়ার যুদ্ধ" এতে প্রায় ১০ হাজারেরও অধিক মুসলমান প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কাফেরকে পরাজিত করে	ফয়যানে ফারুকে আযম, ২/৬৬৮ থেকে ৬৭৬

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওসিলায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

"মাসিক ফয়যানে মদীনা"-এর সংখ্যাগুলো দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকে ডাউনলোড করে পড়ুন এবং অন্যদের শেয়ার করুন।

ترقّی کا راز

امامِ اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قابل ترین شاگرد سے فرمایا: "تم بہت کند ذہن (یعنی پڑھائی میں کمزور) تھے مگر تمہاری کوشش و استقامت نے تمہیں آگے بڑھا دیا۔"

(نیک اعمال پر استقامت پانے کے طریقے، ۱۳)

صلّوا علی الحبیب
صلّی اللہ علی محمد

উন্নতির রহস্য

ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সবচেয়ে যোগ্য ছাত্রকে বলেছিলেন: "তুমি অত্যন্ত মেধাহীন (অর্থাৎ পড়াশোনায় দুর্বল) ছিলে, কিন্তু তোমার প্রচেষ্টা ও অবিচলতা তোমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।"

(নেক আমলের ওপর অবিচল থাকার উপায়, পৃষ্ঠা: ১৩)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪-১১২৭২৬

ঢাকা শাখা: ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

চট্টগ্রাম শাখা: আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কুমিল্লা শাখা: কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Maktaba Tul Madina Bangladesh